মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৯০২৮১৮৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর	২০১৫ ঈসায়ী
পৌষ	১৪২২ বাংলা
রবিউল আউয়াল	১৪৩৭ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭৮৪-৪৭৩৫৮৬

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ৪০.০০ টাকা মাত্র

Muhammed (S.)-er Jibon-e Ekmatro Bissojonin O Chironton Adorso : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-9028188, website : www.khasmujaddidia.org. **Price : Tk. 40.00 Only.**

লেখকের অন্যান্য বই

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)

২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা
২৯. আল-কুরআন : কালামুল্লাহ
৩০. প্রবন্ধ-ত্রয়ী
৩১. কিয়ামত!?
৩২. ইল্‌মে তাসাওফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
৩৩. হুব্বে রাসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলায়হি ওয়াসালণ্ঢামের তাৎপর্য ও গুর"ত্ব
৩৪. মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওহাব নজ্‌দী ও তাঁর মতবাদ
৩৫. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (অনুবাদ গ্রন্থ : ই.ফা.বা.)
৩৬. মহানবী (সা.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ (নাদরাতুন নাঈম) : অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ সদস্য, ই.ফা.বা.।
৩৭. শয়তানের শয়তানী!
৩৮. আল্লাহ্‌র গযব যুগে যুগে!
৩৯. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (ই.ফা.বা.)
৪০. সিরাজাম-মুনিরা
৪১. আসল ঠিকানা!?

সূচীপত্র

১ম অধ্যায় ॥ ৭

* মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ ॥ ৭
* ১. ঐতিহাসিক ভিত্তি ॥ ১০
* ২. পূর্ণতা ॥ ১৫
* ৩. ব্যাপকতা ॥ ১৬
* ৪. কর্মজীবন ॥ ১৮

২য় অধ্যায় ॥ ১৮

* ঐতিহাসিক ভিত্তির স্তর ॥ ১৮
* দুশমনদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (স.) ॥ ২০
* মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা ॥ ২২
* নবী জীবনের সার্বজনীনতা ॥ ৩৩

৩য় অধ্যায় ॥ ৪৫

* বাস্তব কর্মজীবন ॥ ৪৫
* জনৈক ইহুদী মহিলা কর্তৃক খাদ্যে বিষ প্রয়োগ ॥ ৬৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন। আম্মা বাদ :

আল্লাহ্ তায়ালা আল্-কুরআনে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন : আমি তো আপনাকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।

আলোচ্য গ্রন্থে ৩টি অধ্যায় আছে। যথা :

১ম অধ্যায় :

* মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ
* ঐতিহাসিক ভিত্তি
* পূর্ণতা
* ব্যাপকতা
* কর্মজীবন

২য় অধ্যায় :

* ঐতিহাসিক ভিত্তির স্তর
* দুশমনদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (স.)
* মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা
* নবী জীবনের সার্বজনীনতা

৩য় অধ্যায় :

* বাস্তব কর্মজীবন
* জনৈক ইহুদী মহিলা কর্তৃক খাদ্যে বিষ প্রয়োগ

আহকার

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ও প্রফেসর

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মদ (স.) এর জীবনই একমাত্র বিশ্বজনীন ও চিরন্তন আদর্শ

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যুগে যুগে যখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের হিদায়েতের জন্য একটি বিশেষ মানব শ্রেণী প্রেরণ করেন, যাদের নবী-রাসূল বলা হয়। তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ ছিল সকল মানুষের আত্মিক ব্যাধি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। এ পবিত্র দলটি আল্লাহ্‌র যমীনে ছড়িয়ে পড়ে যুগে যুগে তাঁদের শিক্ষা ও হিদায়েতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন।

আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ, সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎকর্ম ও উন্নত জীবনের যা কিছু দেখা যায়, তার সব কিছু এঁদের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে।

যেমন নূহ (আঃ) এর প্রচার উদ্দীপনা, ইব্‌রাহীম (আঃ) এর তাওহিদী প্রেরণা, ইসহাক (আঃ) এর পৈতৃক উত্তরাধিকার, ইসমাঈল (আঃ) এর কুরবানী, মূসা (আঃ) এর বিরামহিন প্রচেষ্টা ও সাধনা, হারুণ (আঃ) এর সত্যপ্রীতি, সুলায়মান (আঃ) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, ঈসা (আঃ) এর খোদাভীতি, ইউনুস (আঃ) এর ভূল স্বীকার, আইয়ুব (আঃ) এর সবর এ সবই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাতিক জীবনের জন্য প্রেরণা দান কারী। এমন উন্নত গুণাবলীর অস্তিত্ব দুনিয়ার যেখানেই দেখা যায়, যা ঐ মহামনীষীদের আদর্শ ও জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

উল্লেখ্য যে, মানুষের উত্তম সমাজ, যতার্থ সভ্যতা- সংস্কৃতি এবং বিশ্বজাহানে তাকে আশরাফুল মাখ্‌লুকাতের মর্যাদা দান করার ব্যাপারে অবশ্য মানব জাতির সমস্ত কর্মীদের অংশ স্বীকার্য।

যেমন জ্যোতির্বিদগণ নক্ষত্রের গতি বর্ণনা, ডাক্তারদের রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার, ইঞ্জিনিয়ারদের বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং শিল্পীদের হাজার হাজার শিল্প সৃষ্টি করা, এদের সবার প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে দুনিয়ার পূর্ণতা এসেছে। তাই আমরা এদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা

তাদের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ, যারা আমাদের আভ্যন্তরীন বা আত্মিক জগতকে সমৃদ্বিশালী করেছেন, আমাদের লোভ-লালসাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, আমাদের আত্মিক রোগের প্রতিষেধক নির্ণয় করেছেন। আমাদের আত্মার ও হৃদয়ের উন্নতি ও আধোঃগতির পন্থা বাতলে দিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে দুনিয়ার মানব সমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে।

উল্লেখ্য যে, এ পবিত্র ব্যক্তিগন তাঁদের নির্ধারিত সময়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন এবং আবার যথাসময়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ধ্বংসশীল বিশ্বের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাঁদের জীবন যতই পবিত্র ও নিষ্কলুষ হোক না কেন, চিরন্তন ও চিরস্থায়ী হবার ক্ষমতা তাঁদের ছিলনা। তাই মনব জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যা পথপ্রদর্শক হতে পারে, তা হচ্ছে লিখিত ভাবে ও মৌখিক বর্ণনা মারফত প্রাপ্ত তাঁদের জীবন-প্রণালী। আমাদের নিকট এ অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের অন্য কোন পন্থা নেই। অতীত কালের বিদ্যা, শিল্প, চিন্তা, গবেষণা, ঘটনা ও অবস্থা জানার জন্য এ ছাড়া আর কোন মাধ্যম নেই। মানব জীবনের এ সমস্ত লিখিত ও বর্ণিত রূপ-রেখা ও প্রতিচ্ছবির নামই ইতিহাস ও জীবন-চরিত।

বস্তুত: আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য একমাত্র নবী- রাসূলগণ ও তাঁদের পদাংক অনুসরণ কারীদের ইতিহাস ও জীবন-চরিতই কার্যকরী ও উপকারী হতে পারে। এই মানুষের নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পূর্ণতার জন্য তাই এ পবিত্র ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত সংরক্ষণ সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

মোট কথা, আমাদের হিদায়াত ও পথ নির্দেশের জন্য আমরা নিষ্কলুষ মানুষ, নিস্পাপ সত্তা ও সকল দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী মনীষীদের মুখাপেক্ষী। আর তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র নবী (আঃ)।মর্তব্য যে, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে তাঁর জাতির সামনে সম- কালীন অবস্থা অনুসারে উন্নত নৈতিক বৃত্তির ও পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলির কোন না কোন উন্নত অলৌকিক নিদর্শন পেশ করেছেন। কেউ সবর, কেউ ত্যাগ, কেউ কুরবানী, কেউ তাওহীদের আবেগ, কেউ হকের প্রেরণা, কেউ আনুগত্য, কেউ পবিত্র মনোবৃত্তি, কেউ খোদা-ভীতি প্রভৃতির উন্নত আদর্শ পেশ করে দুনিয়ায় মানুষের জটিল পথে এক একটি সুউচ্চ মিনার কায়েম করেছেন, যেন তা দেখে মানুষ সোজা ও সরল পথের

সন্ধান লাভ করতে পারে।

কিন্তু তবু এমন একজন পথ- প্রদর্শক ও নেতার প্রয়োজন ছিল। যিনি নিজের হিদায়াত ও বাস্তব কার্যাবলীর দ্বারা সমগ্র পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে পারেন। অর্থাৎ তিনি যেন আমাদের হাতে হিদায়েতের একটি পূর্ণাঙ্গ 'গাইডবুক' প্রদান করেন। আর এই 'গাইডবুকটি' নিয়ে প্রত্যেক মুসাফির যেন অনায়াসে তার গন্তব্যস্থলের সন্ধান লাভ করতে পারে। আর এরূপ নেতৃত্বের ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

অর্থ "হে নবী : আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে। সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শণ কারীরূপে। আর আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহবান কারীরূপে এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে"।[১]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আদেশে, তাঁরই ইবাদাতের জন্য বিশ্ববাসীকে আহবান জানান। যখন বিশ্ব গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, অনাচার-ব্যভিচার তথা যাবতীয় কুকর্মই ছিল মানুষের নিত্য-নৈমিতিতক কাজ। তারা তাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পথ থেকে শুধু যে সরে পড়েছিল তা নয়, বরং খোদাদ্রোহী হয়ে পড়েছিল।

বস্তুত: সব নবীই খোদায়ী বানীর সাক্ষ্যদানকারী তার প্রতি আহ্বানকারী, সুসংবাদ দানকারী, ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রভৃতি হিসেবে এ দুনিয়ায় আসেন। কিন্তু এসব গুণাবলী তাঁদের সকলের জীবনে কার্যত: সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি।

উল্লেখ্য যে, অনেক নবী ছিলেন, যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালন করেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবী সুসংবাদ দানকারীর দায়িত্ব

১. আল্-কুরআন, সূরা আহ্যাব-৩৩, আয়াত : ৪৪-৪৬।

পালন করেন। যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবীগণ। অনেক নবীর বিশেষ গুণ ছিল ভীতি প্রদর্শন। যেমন, হযরত নূহ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত হুদ (আ.) ও হযরত শোয়াইব (আ.) প্রমুখ নবীগণ।

কিন্তু যিনি একই সংগে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদাতা ভীতি-প্রদর্শনকারী, হকের পথে আহ্বায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যাঁর জীবনপটে এসব গুণাবলী স্পষ্টভাবে খোদিত ছিল, তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কারণ, তাঁকে দুনিয়ার সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে একটি পূর্ণাংগ শরীয়ত প্রদান করা হয়েছিল বিধায় একে পূর্ণতা দানের জন্য আর কোন নবী আসার কোন প্রয়োজন রইলো না।

কারণ, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা চিরন্তন স্থায়িত্বের অধিকারী। অর্থাৎ তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। তাই তাঁকে সব দিক থেকে পূর্ণতা প্রদান এবং অক্ষয় সম্পদ দান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, যে চরিত্র বা জীবনাদর্শ মানুষের জন্য একটি আদর্শ জীবনের কাজ করে, তাকে গ্রহণ করার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে এর সর্ব প্রথম হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি।

১. ঐতিহাসিক ভিত্তি

ঐতিহাসিক ভিত্তি হচ্ছে– একজন আদর্শ মানবের জীবন-বৃত্তান্ত যা কিছু পেশ করে তা ইতিহাস ও বর্ণনা পরম্পরার দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। নিছক কিস্‌সা কাহিনী হলে চলবে না। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ জীবন-চরিতের জন্য সর্ব প্রথম তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন হবে অপরিহার্য। কেননা, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত মানব-প্রকৃতির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে, কাল্পনিক গল্প-কাহিনীর দ্বারা তা সম্ভব হয় না।

ঐতিহাসিক ভিত্তির অপরিহার্যতার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, আপনি নিছক কৌতুহল নিবৃত্তি বা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ আদর্শ চরিত্রের নক্‌শা পর্যালোচনা করেন না, বরং এ আদর্শ অনুযায়ী আপনার জীবনকে গড়ে তোলা

এবং তা অনুসরণ করার জন্যেই এরূপ করেন। কিন্তু এ চরিত্র যদি ইতিহাস ও বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তাহলে তার কার্যকারীতা ও কল্যাণকারীতা সম্পর্কে আপনি কি করে জোর দিতে পারেন?

এ অবস্থায় যে কোন লোক একে কাল্পনিক পৌরানিক কাহিনী আখ্যা দিয়ে এর ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই প্রভাবশালী, বাস্তবে কার্যকরী ও অনুসরণযোগ্য হবার জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে এ পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষটির জীবন-চরিত ঐতিহাসিক ভিত্তিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে হবে।

বস্তুতঃ আমরা সকল নবীকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং তাঁদের নবূওতের সত্যতায় ও বিশ্বাসী। এর সাথে আমরা আল্লাহ্‌র এ কথাও স্বীকার করি, যেমন তাঁর বাণী ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থাৎ "এ নবীগণের মধ্যে অনেককে আমি অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[২]

স্মর্তব্য যে, আদর্শের স্থায়িত্ব, নবূওতের সমাপ্তি ও সর্বশেষ পূর্ণাংগ ও আদর্শ মানব-চরিত্র হবার কারণে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন, তা অন্য কোন নবী লাভ করেননি। কারণ, অন্য কোন নবীকে স্থায়ী, শেষ ও খত্‌মে-নবূওতের মর্যাদা দান করা হয়নি। তাঁদের জীবন-চরিত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ জাতির নিকট একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আদর্শ পেশ করা। তাই সে যুগের পর তাঁদের সে আদর্শ ধীরে ধীরে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক ভাষায় লাখো লাখো মানুষ খোদার পয়গাম নিয়ে এসেছেন। একটি প্রচলিত ইসলামী বর্ণনামতে 'এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর দুনিয়ায় আগমণ করেছেন। আজ তাঁদের ক'জনের নাম আমরা জানি? আর যাদের নাম জানি, তাঁদের পূর্ণ বিবরণ ও কি আমরা জানি?

* হিন্দু সম্প্রদায় দাবী করে যে, তারা দুনিয়ার সব চাইতে প্রাচীন জাতি।

---

২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা-২; আয়াত : ২৫৩।

যদিও প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, তবু ও গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, তাদের ধর্মে শত শত মনীষীর নাম পাবেন। কিন্তু এসব মনীষীর এক-জনের জীবনও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রামাণ্য নয়। তাঁদের অনেকের কেবল নামটি ছাড়া আর কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং পৌরানিকতার সীমা পেরিয়ে ইতিহাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। তাদের সব চাইতে বেশী জ্ঞাত চরিত্র হচ্ছে রামায়ন ও মহাভারতের নায়ক-নায়িকাগণ। কিন্তু তাদের জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা জানা যায়, তার মধ্যে কোনটিকে ঐতিহাসিক বলা যায় না। কেননা, জানা যায় না যে, এ ঘটনাবলী কোন কালের, কোন শতাব্দীর ও কোন বর্ষের।

বস্তুতঃ বর্তমানে ইউরোপের কতিপয় পন্ডিত অনেক কল্পনা ও অনুমাণের মাধ্যমে কতক সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের হিন্দু শিক্ষিত সমাজ সেগুলিকেই তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু ইউরোপীয় পন্ডিতদের বেশী সংখ্যকই এমন, যারা এগুলিকে ইতিহাসের পর্যায়ে ফেলেন না, বরং এসব ঘটনা কোনদিন বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল বলেও স্বীকার করেন না।

* ইরানের প্রাচীন পার্শী ধর্মের প্রবর্তক 'যরথুষ্ট্র' আজো লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও প্রাচীনতার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে আছে। এমন কি তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ও অনেক ইউরোপীয় ও আমেরিকান পন্ডিত সন্দেহ পোষণ করেন।

প্রাচ্য-বিদদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তারা বহু ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে তাঁর জীবন-বৃত্তান্তের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু তাও বিভিন্ন পন্ডিতের পরস্পর-বিরোধী মতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, কোন ব্যক্তি তার উপর নির্ভর করে নিজের কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। 'যরথুষ্ট্রের' জন্মস্থান, জন্মবর্ষ, জাতীয়তা, বংশ, ধর্ম, ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় পুস্তিকার যথার্থতা, ভাষা, মৃত্যুবর্ষ, মৃত্যুস্থান প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনার অভাব এত প্রকট যে, আন্দাজ-অনুমান ছাড়া এ প্রশ্নগুলির প্রকৃত জবাব যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। এসব কারণে পার্শীগণ সরাসরি নিজেদের বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেহযুক্ত এ অনুমানগুলির জ্ঞান

রাখেন না; বরং আজ-কাল ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত থেকে তারা এগুলি বুঝবার চেষ্টা করছেন। আর তাদের নিজস্ব জ্ঞানের মাধ্যম ফেরদৌসীর 'শাহনামা' অতিক্রম করতে পারিনি। 'গ্রীক দুশমনরা সেসব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে'- তাদের এ ওজর নিতান্তই অর্থহীন। তাই এখন বলা যায় যে, সেসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এ থেকে প্রমাণিত যে, ওটা স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন জীবন লাভ করতে পারিনি। আর এজন্য কের্ণ (Kern) ও ডার-মিটিটার (Der Meteter)-এর ন্যায় গবেষক ও পণ্ডিতগণ 'যরথুষ্ট্রের' ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি অস্বীকার করেছেন।

* প্রাচীন এশিয়ার সব চাইতে ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে- 'বৌদ্ধ ধর্ম'। এ ধর্মটি এক সময় ভারতবর্ষ, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কীস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং আজও বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দো চীন, চীন, জাপান ও তিব্বতে এ ধর্ম বর্তমান আছে। অবশ্য এখন বলা যায় যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং মধ্য এশিয়ায় 'ইসলাম' আগমণের কারণে এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও কি তারা বুদ্ধের জীবন ও চরিত্রকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব দান করতে পেরেছে? আর কোন ঐতিহাসিক কি ঐ জীবন-চরিতের সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দানের ক্ষমতা অর্জন করেছেন?

বস্তুত: স্বয়ং বুদ্ধের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা হয় মগধ দেশের রাজাদের বিবরণ থেকে। অর্থাৎ এটা নিরূপণ করারও অন্য প্রমাণ নেই। ঘটনাক্রমে গ্রীকদের সাথে তৎকালীন মগধদেশীয় রাজাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তাই আজ তাদের শাসনকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

* জৈন ধর্ম প্রবর্তকের জীবন বৃত্তান্ত আরো অধিক অনিশ্চিত। অনুরূপ চীনের 'কন্‌ফুসিয়াস' সম্পর্কে আমরা বুদ্ধের চাইতেও অনেক কম তথ্য জানি। অথচ তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি।

* উল্লেখ্য যে, সেমেটিক জাতির মধ্যে শত শত নবী-রাসূল এসেছেন। কিন্তু কেবল নাম ছাড়া ইতিহাসে তাদের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

যেমন– হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্‌রাহীম (আ.), হযরত হুদ (আ.),

হযরত সালেহ (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.); হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াক্বব (আ.), হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জীবনও চরিত্রের এক একটি বিশেষ অংশ ছাড়া আর কিছুই জানাতে পারে না। তাঁদের জীবনের অনেক অংশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাঁদের পবিত্র জীবনের অবলুপ্ত অংশ কি কোন পূর্ণাংগ মানব জীবনের জন্য অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

বস্তুত: কুরআন মযীদকে বাদ দিলে ইহুদীদের যে সব কিতাবে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী লিখিত আছে, তারমধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে ধর্মীয় পন্ডিতগণ বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ পোষণ করেছেন। এ বিষয়গুলি বাদ দিলেও যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ চিত্রই আমাদের নিকট পেশ করে।

স্মর্তব্য যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা আমরা তাওরাতে জানতে পারি। কিন্তু যে তাওরাত আজ আমাদের কাছে আছে, সে সম্পর্কে গবেষকদের অভিমত এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শত শত বছর পর তা রচিত হয়েছে। 'ইনসাই ক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার' লেখকগণ ও এ কথা স্বীকার করেছেন। অধুনা অনুসন্ধান চালিয়ে জার্মান পন্ডিতগণ আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান তাওরাতে প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কে পাশাপাশি দুটি করে সূরা বা বর্ণনা লিখিত হয়েছে এবং সেগুলি অনেক স্থানে পরস্পরবিরোধী। এজন্য তাওরাতের জীবন কথা ও ঘটনাবলীতে আমরা প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনা দেখতে পাই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার সর্বশেষ সংস্করণের 'বাইবেল' প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। এ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.) বরং হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত সকল নবীদের জীবন-বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু মযবূত থাকে?

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী ইন্‌যীল গ্রন্থসমূহে লেখা আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখিত অসংখ্য ইন্‌যীলের মধ্যে বর্তমান খৃষ্টান জগতের বিরাট অংশ মাত্র চারটি ইন্‌যীলের কথা স্বীকার করে। অবশিষ্ট ইন্‌যিলগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে তারা মনে করে।

স্মর্তব্য যে, ঐ চারটি ইন্‌যীলের মধ্যে কোন একটির লেখক ও স্বচক্ষে হযরত

ঈসা (আ.)কে দেখেননি! তাঁরা কার মুখ থেকে শুনে এ ঘটনাবলী লিখেছেন, একথা ও জানা যায়নি। বরং যে চার ব্যক্তির সাথে ঐ চারাটি কিতাবকে সম্পর্কিত করা হয়, তাদের সাথে এ কিতাব গুলির সম্পর্ক সঠিক কিনা, এ বিষয়ে ও বর্তমানে সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে। ঐ কিতাবগুলি কোন ভাষায় ও কোন যুগে লেখা হয়েছিল তাও স্পষ্টরূপে জানা যায়নি। তবে ঈসায়ী ৬৭ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইন্‌যীল-ব্যাখ্যাতা উল্লেখিত কিতাব গুলির রচনাকাল উল্লেখ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিত্ব-বাদের শিক্ষাকে সামনে রেখে কতিপয় আমেরিকান সমালোচক ও যুক্তিবাদী বলেছেন যে, হযরত ঈসার অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক এবং তাঁর জন্ম ও ত্রিত্ব-বাদের বর্ণনা গ্রীকদের ধর্মীয় কাহিনীর অনুকরণ মাত্র। কেননা, গ্রীক জাতির বিভিন্ন দেবতা ও বীরদের সম্পর্কে এ জাতির ধারণা পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল।

এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টানদের বর্ণনা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের যেসব বিবরণ পাওয়া যায়। তার ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

২. পূর্ণতা

উল্লেখ্য যে, কোন মানব-চরিত্র তখনই কর্মজীবনের জন্য চিরস্থায়ী আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে, যখনই তার জীবনগ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং তার জীবনের কোন একটি ঘটনা ও রহস্য অন্ধকারে না থাকে। বরং তার জীবনের সবকিছু মানুষের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট থাকে। এরূপ হলেই উক্ত জীবন মানব সমাজের জন্য একটি আদর্শরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য কিনা, তা যাচাই করা যেতে পারে।

আর এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবন ও চরিত্র যাচাই করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ এ মানদণ্ডে টিকে না। এ থেকেই জানা যায় যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবেই দুনিয়ায় এসেছিলেন।

৩. ব্যাপকতা

উল্লেখ্য যে, কোন জীবন-চরিতের পক্ষে বাস্তব আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে-এর ব্যাপকতা। ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন মানব শ্রেণীর পথ নির্দেশও আলোক লাভের জন্য যে সব আদর্শের প্রয়োজন। তা সবই উক্ত জীবনের মধ্যে থাকতে হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করলে দেখা যাবে যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউই সেই পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হতে পারেন না।

যদি প্রশ্ন করা হয় ধর্ম কি? জবাব হলো– আল্লাহ্‌র ও বান্দার এবং বান্দাদের পরস্পরের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেগুলো স্বীকার ও সম্পাদন করা। আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক এ উভয় দিক দিয়ে বিস্তারিত বিষয় অনুসন্ধান করতে গেলে একমাত্র ইসলামের পয়গম্বর ব্যতীত আর সর্বত্রই নিরাশ হতে হয়।

বস্তুত: ধর্ম দু'প্রকার। এক প্রকার ধর্মে খোদাকে স্বীকারই করা হয়নি, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তাই এ ধর্মে খোদা, তাঁর সত্তা, তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর বিভিন্ন অধিকারের প্রশ্নই নেই। তাই তাদের প্রবর্তকদের মধ্যে খোদা প্রেম, আন্তরিকতা তাওহীদ প্রভৃতির অনুসন্ধানই অর্থহীন।

আর দ্বিতীয় প্রকার ধর্মে কোন না কোনভাবে খোদাকে স্বীকার করা হয়েছে। এসব ধর্মের প্রবর্তক ও নবীদের জীবনে খোদার আনুগত্য সম্পর্কিত ঘটনাবলী অনুপস্থিত। সমস্ত তাওরাত পাঠ করলে দেখা যায় যে, খোদার তাওহীদ ও তাঁর নির্দেশাবলী এবং কুরবানীর শর্তসমূহ ছাড়া তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থে এমন একটি বাক্য নেই, যা থেকে জানা যায় যে, খোদার সাথে হযরত মূসার আন্তরিক সম্পর্ক, খোদার আনুগত্য ও বন্দেগী, খোদার প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস তাঁর হৃদয়ে কোন পর্যায়ে ছিল।

হযরত ঈসার জীবন-মুকুর হচ্ছে ইন্‌যীল। খোদা হযরত ঈসার পিতা- এই একটি মাত্র বিষয় ছাড়া ইন্‌যীলে আমরা এমন আর কিছু পাই না, যার দ্বারা এ পিতা ও পুত্রের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরণ স্থির করা যায়।

এবার বান্দার হক সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ আলোচনায় ও দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

ছাড়া আর সকল নবীর জীবনই প্রায় শূন্য।

যেমন– বুদ্ধদের তাঁর স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে ত্যাগ করে বনের পথ ধরেন। তিনি তাঁর যে প্রিয় স্ত্রীকে ভালবাসতেন, তার ও একমাত্র পুত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেননি। তিনি বন্ধুদের সংগ পরিত্যাগ করেন। দেশ শাসন ও প্রজা পালনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেন এবং নির্বান বা মৃত্যু লাভ করাকেই মানব জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করেন। এমতাবস্থায় এ পৃথিবীর মানব সমাজে– যেখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধব সবাই আছে– সেখানে বুদ্ধের জীবনাদর্শ মানুষের কোন কাজে আসে না। বুদ্ধের জীবনে কি এমন কোন ব্যাপকতা আছে, যার ফলে তা সংসার ত্যাগী ভিক্ষুর সাথে সাথে সংসারবাসী গৃহীর জন্যও সমানভাবে অনুকরণযোগ্য হতে পারে। তাই তাঁর জীবন, তাঁর ধর্মানুসারী ব্যবসায়ীদের জন্য অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। যদি তাই হতো, তাহলে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন, তিব্বত ও বার্মায় সকল প্রকার শিল্প, রাজনীতি এবং যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এক দিনেই বন্ধ হয়ে যেত!

হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনের একটি দিক অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তা হচ্ছে তাঁর যুদ্ধ ও সৈন্য-পরিচালনা। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র ভাই-ভাই ও বন্ধু বান্ধবদের সম্পর্কে রক্ষার ব্যাপারে তাঁর নীতি কি ছিল, সন্ধি ও চুক্তির দায়িত্ব তিনি কিভাবে পালন করতেন, তাঁর জীবন চরিত থেকে তা জানা যায় না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মা ছিলেন এবং ইন্‌যীলের বর্ণনামতে ভাইবোনও ছিল, বরং রক্ত মাংসের পিতাও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের ঘটনাবলী থেকে ঐসব আত্মীয়-পরিজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহারের ধরণ জানা যায় না। অথচ দুনিয়া চিরকাল ঐসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই আবাদ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

এছাড়া হযরত ঈসা (আ.) শাসিতের জীবন-যাপন করেছিলেন, তাই তাঁর জীবন-চরিত শাসকসুলভ দায়িত্ব পালনের নজীর শূন্য। তিনি বিয়ে করেননি, কোন দিন গৃহ-সংসার, পুত্র-পরিজন ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-সন্ধি ও বন্ধু-শত্রুর মধ্যকার সম্পর্কের সাথে সম্পর্ক রাখেননি, তিনি ঐসব বিষয়ে দুনিয়ার জন্য কিভাবে আদর্শ হতে পারেন?

৪. কর্মজীবন

আদর্শ জীবনের সর্বশেষ মানদ হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। এর অর্থ হচ্ছে ঃ দ্বীনের ব্যবস্থাপক ও ধর্ম-প্রবর্তক যে শিক্ষা দান করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের এ শিক্ষার বাস্তবায়ন ও জ্বলন্ত-নমুনা দেখা যাবে এবং তাঁর নিজের কর্মজীবনই তাঁর শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী প্রমাণিত করবে। এ মানদে ও একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন জীবন-চরিত টিকবে না।

উল্লেখ্য যে, একামাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই কিয়ামত পর্যন্ত এবং সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য ও আদর্শরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তাঁর চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলী সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী হিসাবে সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল এবং এটিই নবীদের আগমণ পরম্পরা শেষ হবার শ্রেষ্ঠতম, চূড়ান্ত ও সবচাইতে অধিক কার্যকরী প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক ভিত্তির স্তর

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন ও চরিত্রের সর্বপ্রথম মানদ হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ বিষয়ে সমগ্র দুনিয়া একমত যে, ইসলাম তার নবীর পবিত্র জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকটি ঘটনা এমনভাবে সংরক্ষণ করেছে যে, আজো ও তা সমস্ত দুনিয়ার জন্য বিস্ময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের যে সমস্ত ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে তার উৎস এবং সেগুলি কিভাবে সংযোজিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার বর্ণনা ঃ

১ম উৎস হচ্ছে : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের সব চাইতে নির্ভুল অংশের উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ।

আর আল্-কুরআনের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোন শত্রুরা ও কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের সমস্ত

প্রয়োজনীয় অংশ, প্রাক-নবূওত জীবন, পিতৃ-মাতৃহীন জীবন, দারিদ্র, সত্যের সন্ধান, নবূওত, ওহী, ঘোষণা ও প্রচার, মিরাজ, বিরোধী পক্ষের শত্রুতা, হিজরত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চারিত্রিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এর চাইতে অধিক নির্ভরযোগ্য জীবন-চরিতের সন্ধান দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই।

২য় উৎস হচ্ছে : আল্-হাদীস। এর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে নির্ভুল, দুর্বল ও মনগড়া হাদীস সমূহ আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'সিহাহ্-সিত্তা' বা ছয়টি নির্ভুল হাদীসগ্রন্থের প্রত্যেকটি হাদীস সঠিক যাচাই পরখের পর বর্ণিত হয়েছে। এরপর আছে বিভিন্ন মুসনাদ, যার মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থটি সর্ববৃহৎ। এসব সংকলন সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত ও শিক্ষা সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

৩য় উৎস হচ্ছে ঃ মাগাজী। এসব গ্রন্থে মূলত: রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের বর্ণনা রয়েছে। এতে অন্যান্য ঘটনায়ও উল্লেখিত হয়েছে।

৪র্থ উৎস হচ্ছে : সাধারণত ইতিহাস গ্রন্থসমূহ। এগুলির প্রথম অংশ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন সংক্রান্ত। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও ঘটনাবহুল গ্রন্থ হচ্ছে 'তাবাকাতে ইবনে সাআদ' এবং ইমাম জাফর তিবরীর 'তারিখুর রাসূল ওয়াল মুলক', ইমাম বুখারীর 'তারিখে সগীর ও কবীর' প্রভৃতি।

৫ম উৎস হচ্ছে : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ। এগুলিকে 'কুতুবে দালায়েল' বলা হয়। যেমন, ইবনে কুতায়বার 'দালায়েলুন নবূওত', আবু ইসহাকের 'দালায়েলুন নবূওত' প্রভৃতি কিতাবসমূহ।

৬ষ্ঠ উৎস হচ্ছে : শামায়েল গ্রন্থসমূহ। এতে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র। আচার ব্যবহার-অভ্যাস ইত্যাদি বিষয় লেখা হয়েছে। এ শাখায় সর্বপ্রথম ও সবচাইতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো ইমাম তিরমিযী (র)-এর 'শামায়েল' গ্রন্থ। এ ছাড়া আরো অনেক কিতাব রয়েছে।

৭ম উৎস হচ্ছে : মক্কা ও মদীনার অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থসমূহ। এতে এ শহরদ্বয়ের সাধারণ বৃত্তান্ত ছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে যে সব স্থানের সম্পর্ক ছিল, সে সবের নাম, পরিচয় ও অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ হচ্ছে– 'আখবারে মক্কা' 'আখবারে-মদীনা' গ্রন্থদ্বয়।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময় থেকে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষায় তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত, ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত কিতাব লেখা হয়েছে তার সংখ্যা কয়েক হাজার।

দুশমনদের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (স.)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করা মুসলমানদের জন্য দ্বীন ও ঈমানের দাবী। যারা মুসলিম নয়, মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে তাদের অভিমত পেশ করা হচ্ছে :

উল্লেখ্য যে, ভারতের অনেক হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনী লিখেছেন। ইউরোপ ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল নয়। তবুও সেখানে মিশনারীদের সেবার জন্য, অথবা তত্ত্বগত রুচি বা বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় দু'হাজার।

উল্লেখ্য যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপক D.S. Margoliouth লিখিত এবং ১৯০৫ সালে 'হিরোজ অব দি নেশান্স' সিরিজ কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজী গ্রন্থ 'মুহাম্মদ'-এর চাইতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত অধিকতর বিষাক্ত পুস্তক আর একটিও লেখা হয়নি। এতে তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেশ করে নবী-চরিতকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। তবু এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি এ সত্যটি স্বীকার না করে পারেননি যে,

"মুহাম্মদের জীবনীকারদের সিল্‌সিলা শেষ হওয়া অসম্ভব; কিন্তু তাঁদের মধ্যে স্থান লাভ করা একটি বিরাট সম্মান।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন ডেভিন পোর্ট ইংরেজী ভাষায় সর্বাধিক সহানুভূতিপূর্ণ গ্রন্থ

'এ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ এন্ড দি কুরআন' লেখেন। তিনি তাঁর গ্রন্থটি এভাবে শুরু করেনঃ

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল আইন-প্রণেতা ও বিজয়ীগণের মধ্যে একজন ও এমন নেই, যার জীবন-বৃত্তান্ত মুহাম্মদের জীবন-বৃত্তান্তের চাইতে অধিক বিস্তারিত ও সত্য।"

অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজের ফেলো রেভারেন্ড বাসওয়ার্থ স্মিথ, ১৮৭৪ সালে 'রয়াল ইনিষ্টিটিউশান অব গ্রেট ব্রিটেন'-এ 'মুহাম্মদ' এবং 'মোহামেডানিজম' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এটি পরে বই আকারে মুদ্রিত হয়। এতে রেভারেন্ড সাহেব বলেছেন :

"ধর্ম সম্পর্কে সাধারণত: এর প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত থাকার কারণে যা কিছু সত্য, দুর্ভাগ্য বশত: এ তিনটি ধর্ম ও এদের প্রবর্তকদের সম্পর্কেও তা সত্য। অন্য কোন ভাল নাম না থাকার কারণে আমরা এদেরকে ঐতিহাসিক ভিত্তি বলে থাকি। আমরা ধর্মের প্রাথমিক প্রারম্ভিক কালের কর্মীদের সম্পর্কে খুব কম এবং তাদের শ্রমের সাথে যারা পরবর্তীকালে নিজেদের শ্রম মিলিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে সম্ভবত: অনেক বেশী জানি। আমরা যরথুষ্ট্র ও কনফুসিয়াস সম্পর্কে সুলান ও সক্রেটিসের চাইতে অনেক কম জানি। মূসা ও বুদ্ধ সম্পর্কে তার চাইতে অনেক কম জানি, যা এ্যামব্রেস ও জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে জানি। আমরা আসলে ঈসা-মসীহের জীবনের একটি অংশের আংশিক জ্ঞান রাখি। যে তিরিশটি বছর তিন বছরের জন্য পথ পরিষ্কার করলো, তাকে আবরণমুক্ত করবে কে?

যা কিছু আমরা জানি, তা হচ্ছে এই যে, তিনি দুনিয়ার এক তৃতীয়াংশকে জীবিত করেছেন। আমরা ঈসার মাতা, তাঁর সংসার জীবন, তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর আধ্যাত্মিক মিশনের অভ্যুদয় সম্পর্কে আমরা কীই বা জানি? এগুলি সম্পর্কে আমাদের মনে কত প্রশ্নই না জাগে! এগুলি চিরদিন প্রশ্নই থেকে যাবে।

অপরপক্ষে, ইসলামে প্রত্যেকটি বস্তু বৈশিষ্টমন্ডিত। এখানে কোন অস্পষ্টতা ও রহস্য নেই। আমাদের নিকট ইতিহাস আছে। আমরা 'মুহাম্মদ' সম্পর্কে এত বেশী জানি, যেমন জানি লুথার ও মিলটন সম্পর্কে। এখানে সমগ্র

পরিস্থিতি স্বচ্ছ দিবালোকে ভাস্বর। প্রত্যেকটি বস্তুর উপর সে আলো পড়েছে এবং সবার নিকট পৌঁছতে পারে।" (পৃষ্ঠা ঃ ১৪-১৫ ঃ ১৮৮৯ খৃঃ)

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন সংক্রান্ত হাযার-হাযার কিতাব মুসলমান লেখকগণ রচনা করেছেন এবং এখনো করছেন। এর প্রতিটি কিতাব অন্যান্য নবীগণের জীবন-চরিত সংক্রান্ত কিতাবগুলির তুলনায় অধিক স্বচ্ছ। নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন-চরিত ও তাঁর হাদীসসমূহ লক্ষ লক্ষ লোক শুনেছে এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই বলা যায়, মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন-চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি খুবই মজবূত।

মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা

উল্লেখ্য যে, কোন মানুষের জীবন যতই ঐতিহাসিক হোক না কেন, যতক্ষণ না তার মধ্যে মানবিক গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে ততক্ষণ তা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে না। আর কোন জীবনের পূর্ণাংগ মানবিক গুণাবলীর সমাবেশ এবং তা সব কিছু থেকে ত্রুটিমুক্ত তখনই প্রমাণিত হতে পারে, যখন তার সমস্ত অংশ আমাদের সামনে থাকে।

স্মর্তব্য যে, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর সময়ের লোকদের সামনে ছিল এবং তাঁর ওফাতের পর বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তা পুরোপুরি সংরক্ষিত আছে। তাঁর জীবনে সামান্যতম অংশ এমন নেই যে, ঐ সময় তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিলেন।

যেমন তাঁর জন্ম, দুধপান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যবসায়ে যোগদান, চলাফেরা, বিবাহ, নবূওত পূর্বকালের বন্ধু-বান্ধব, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ ও চুক্তিতে অংশ গ্রহণ, 'আল-আমীন উপাধি লাভ, কাবাগৃহে হাজ্‌রে আসওয়াদ স্থাপন, ধীরে ধীরে নির্জন প্রিয়তা, হেরা গুহায় নি:সংগ অবস্থান, ওহী নাযিল, ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান, প্রচার অভিযান, বিরোধীতা, তায়েফ গমন, মিরাজ হিজরত, যুদ্ধ, হোদাইবিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন দেশে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ, ইসলাম প্রচার, দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান, বিদায় হজ্জ, ইন্‌তিকাল-এর

মধ্যের কোন সময় দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিসীমার আড়ালে নেই।

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন একটি মুহূর্ত ও পর্দার অন্তরালে ছিল না। ঘরের মধ্যে তিনি থাকতেন স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এবং বহিরে বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তদের মজলিসে।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার বিরাট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও নিজের ঘরে সাধারণ মানুষ হিসাবেই থাকেন। তাই ভল্টেযারের কথায় বলা যায়: No man is herotohis valet, অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি নিজের ঘরে 'হিরো' হতে পারে না।'

বাসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'লাইফ অফ্ মুহাম্মদ'-এ বলেছেন : "এ বক্তব্যটি ইসলামের নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে সত্য নয়।"

ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন : 'মুহাম্মদের ন্যায় অন্য কোন নবী তাঁর অনুসারীদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী করেননি। যারা তাঁকে মানুষ হিসাবে ভালভাবেই জানতেন, তাদের সামনে হঠাৎ তিনি নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করেন। নিজের স্ত্রী, নিজের গোলাম, নিজের ভাই এবং নিজের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের সামনে তিনি নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করেন এবং তারা বিনা দ্বিধায় তাঁর দাবী মেনে নেন।'

মানুষের জীবনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর স্ত্রীর চাইতে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। কিন্তু এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী 'খাদীজাতুল কুব্‌রা' ঈমান এনেছিলেন? নবূওত লাভের পূর্বে পনের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। তাঁর সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। এসব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (স.) নবূওত দাবী করার পর তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নেন।

স্মর্তব্য যে, অতিমহান ব্যক্তিও যিনি মাত্র একজন স্ত্রীর স্বামী, তিনি ও তার স্ত্রীকে এ মর্মে ব্যাপক অনুমতি দানের হিম্মত রাখেন না যে, 'তুমি আমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনা মানুষের সামনে বলে দেবে এবং যা কিছু গোপন আছে, তা-ও সকলের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

কিন্তু উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর একই সঙ্গে নয়জন স্ত্রী ছিলেন এবং তাদের সকলকে তিনি এ অনুমতি দিয়েছিলেন যে, 'নির্জনে আমার মধ্যে যা

কিছু দেখো, তা বিনাদ্বিধায় জনসমক্ষে বিবৃত করো। রাতের আধারে যা দেখো, দিনের বেলায় তা প্রকাশ করে দিও। কপাটবদ্ধ ঘরের মধ্যে যা দেখো, খোলা ময়দানে তা সবাইকে শুনিয়ে দিও। এহেন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যযের নবী আর কেউ নেই!

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ (স.) নির্জনে বা জনসমক্ষে, মসজিদে বা জিহাদের ময়দানে, রাতের নামাজে মশ্‌গুল বা সেনা-দলের সংগঠনে ব্যস্ত, মিম্বরের উপর বা নির্জন কক্ষে- যখন যেখানে থাকতেন, সর্বাবস্থায় তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে হুকুম দিয়েছিলেন:

"তোমরা আমার যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মকে মানুষের সামনে তুলে ধরো।"

তাঁর পবিত্র বিবিগণ তাঁর নির্জন কক্ষের অবস্থা ও ঘটনাবলী প্রকাশ করতেন। মসজিদে নববীর একটি উঠান ছিল গৃহহীন সাহাবী সেখানে অবস্থান করতেন। তাঁরা দিনের বেলা পালা ক্রমে বন থেকে কাঠ কেটে আনতেন, তা বিক্রি করে খাবার ব্যবস্থা করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী শ্রবণ করতেন। তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও তাঁর সাহচর্যে অবশিষ্ট সময় কাটাতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁদের মধ্যের একজন ছিলেন। তাঁর চাইতে, কোন সাহাবী অধিক হাদীস বর্ণনা করেননি।

বলা যায়, এ সত্তর জন সাহাবীভক্ত গুপ্তচরের ন্যায় অতি আগ্রহ সহকারে সব সময় তাঁর অবস্থা দেখতেন এবংতা অন্যের নিকট বর্ণনা করতেন। মদীনার সব অধিবাসী একাদিক্রমে দশ বছর যাবৎ প্রতিদিন অন্তত: পাঁচবার তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করতো। যুদ্ধকালে হাজার হাজার সাহাবী দিবারাত্রি তাঁকে দেখার ও তাঁর অবস্থা অবগত হবার সুযোগ লাভ করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার, তাবুক যুদ্ধে তিরিশ হাজার এবং বিদায় হজ্জে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবী তাঁকে দেখার সুযোগ পান। এভাবে নির্জনে ও জনসমক্ষে, ঘরে ও বাইরে, মসজিদের মধ্যে ও মসজিদের উঠানে সাহাবাদের মজলিসে, শিক্ষালয়ে ও যুদ্ধক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছেন তার ব্যাপক প্রচারের জন্য তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল।

আজো তাঁর শত্রু ও বিরোধীরা সব-রকমের যাচাই-পরখ ও অনুসন্ধান

চালাবার পর মাত্র 'জিহাদ' ও 'তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা' ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি। তাহলে এমন জীবনকে মাসূম ও নিষ্পাপ বলা সংগত, না এমন জীবনকে নিষ্পাপ বলা সংগত, যার জীবনের বিরাট অংশ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে?

অন্যভাবে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স.) সব সময় তাঁর ভক্তদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন না, বরং তিনি মক্কায় কুরায়শদের মাঝে অবস্থান করেন। তিনি নবূওতপূর্ব চল্লিশটি বছর তাদের মাঝে কাটান।

তাছাড়া ব্যবসায়ী জীবন, লেনদেন, ব্যবহারিক ও কারবারী জীবন; যেখানে প্রতি পদেপদে অসদ্ব্যবহার, ওয়াদা-খেলাফী ও খিয়ানতের গভীর আবর্ত বিদ্যমান ছিল, এসব পথ তিনি এমন সতর্কতার সাথে অতিক্রমণ করেন যে, তাঁকে জনগণ 'আমীন' উপাধি দান করে এবং তাঁর নবূওত লাভের পরে ও লোকেরা তাঁকে আগের মত বিশ্বস্ত মনে করে তাঁর কাছে তাদের আমানতসমূহ গচ্ছিত রাখতেন। তাই তিনি হিজরতের সময় লোকদের আমানত ফেরত দেবার জন্য হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় রেখে যান। তাঁর নবূওত দাবীর বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিক্ষোভ প্রকাশ করে। তাঁকে সামাজিক বয়কট করে, তাঁর সাথে সব রকমের শত্রুতা করে, তাঁকে গালি দেয়। তাঁর পথ রোধ করে তাঁর ওপর নাপাক-আবর্জনা নিক্ষেপ করে। তাঁর প্রতি পাথর ছুড়ে মারে। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তাঁকে যাদুকর আখ্যা দেয়, কবি বলে আখ্যায়িত করে, পাগল বলে বিদ্রূপ করে।

কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার, কর্ম ও চরিত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার কেউ সাহসও করেনি। অথচ নবূওত ও পয়গম্বরীর দাবীর অর্থই হচ্ছে দাবীদার নিজের নিষ্পাপ নিষ্কলুষ ও মাসূম হওয়ার অবস্থা ঘোষণা করছে। এ দাবী বাতিল করার জন্য তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি শত্রুতামূলক সাক্ষ্যই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এ দাবীটি বাতিল করার জন্য বিরোধীরা তাদের অর্থ ব্যয় করেছে, সন্তানদের কুরবানী করেছে, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; এতদসত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি দোষারোপ করে, একে চিরতরে ধুলিস্মাৎ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি বন্ধুদের চোখে যেমন ছিলেন, শত্রুদের চোখেও তা থেকে মোটেও ভিন্নতর ছিলেন না। আর তাঁর জীবনের কোন অংশই পর্দার অন্তরালে বা অজ্ঞাত ছিল

না।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একদিন কুরাইশদের বড় বড় নেতারা মজলিস সরগরম করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কেই চলছিল গরমগরম আলোচনা। তখন সেখানে কুরাইশদের অন্যতম অভিজ্ঞ ও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকারী নেতা নাযার ইবনে হারিস বলেন :

'হে কুরাইশগণ! তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছে, তার কোন সুরাহা তোমরা করতে পারলে না। মুহাম্মাদ তোমাদের সামনে শিশু থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে, সে তোমাদের মাঝে সব চাইতে জনপ্রিয়, সত্যবাদী ও আমানতদার ছিল। আর এখন তার চুল সাদা হতে চলেছে এবং সে এখন তোমাদের সামনে এসব কথা বলছে। আর তাই তোমরা তাকে বলছো, যাদুকর, গুনিন, কবি ও পাগল। খোদার কসম! আমি তার কথা শুনেছি। মুহাম্মদের মধ্যে এ দোষগুলির একটিও নেই।' (সিরাতে ইবন হিশাম বর্ণিত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সব চাইতে বড় শত্রু আবু জেহেল বলতো: 'হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে মিথ্যা বলছিনা, তবে তুমি যা কিছু বলছো এবং বুঝাতে চাচ্ছ, সেগুলিকে আমি সত্য মনে করি না।'

আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে :

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

অর্থাৎ "আমি জানি যে, কাফিরদের কথা আপনাকে মর্মাহত করে। তবে এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং এ জালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।"[৩]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ (স.)-কে হুকুম দিলেন যে, 'তুমি তোমার খান্দানের লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দাও; তখন তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট সকলকে সমবেত করে বললেন :

"হে কুরাইশগণ! যদি আমি তোমাদের একথা বলি যে, এ পাহাড়ের পেছন

৩. আল-কুরআন; সূরা আনআম-৬; আয়াত : ৩৩।

থেকে একটি সেনাদল তোমাদের ওপর হামলা করতে আসছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো : হ্যাঁ, কারণ আমরা কখনো তোমাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।" (সহীহ বুখারী বর্ণিত)।

আরো প্রণিধানযোগ্য যে, রূমের কায়সারের দরবারে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দূত পৌঁছেছেন, কুরাইশ বংশীয় কাফিরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী আবু সুফিয়ান, যিনি একাধিক্রমে ছয় বছর তার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, তাকেই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিবরণ সম্পর্কিত সাক্ষ্য ও অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এক শত্রু তার এমন এক শত্রুর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে, যাকে সে মনেপ্রাণে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এমন এক পরাক্রমশালী বাদশার দরবারে এ সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে যে, তাকে কোনক্রমে রাজী করাতে পারলেই মুহূর্তের মধ্যে তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরগুলো এরূপঃ

বাদশাহ কায়সার : নবূওতের দাবীদারের বংশগত মর্যাদা কোন পর্যায়ের?

আবু সুফিয়ান : সম্ভ্রান্ত।

কায়সার : এর আগে এ বংশের কেউ কি নবূওতের দাবী করেছে?

আবু সুফিয়ান : না।

কায়সার : এ বংশের কেউ বাদশাহ ছিল কি?

আবু সুফিয়ান : না।

কায়সার : যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছেন তারা দুর্বল না প্রভাবশালী?

আবু সুফিয়ান : দুর্বল।

কায়সার : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?

আবু সুফিয়ান : বেড়েই চলেছে।

কায়সার : তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন ঘটনা কি তোমরা জানতে পেরেছ?

আবু সুফিয়ান : না।

কায়সার : তিনি কি কখনো নিজের প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভংগ করেছেন?

আবু সুফিয়ান : এখনো পর্যন্ত তো ভংগ করেননি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।

কায়সার : তিনি কি শিক্ষা দেন?

আবু সুফিয়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। নামাজ পড়, পাপ কাজ থেকে দূরে থাক, সত্য কথা বল, আত্মীয়-পরিজনদের হক আদায় কর।

বস্তুত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন ছাড়া অন্য কোথাও কি এমন নাযুক অবস্থায় এমন সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে? তাঁর চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলীর পূর্ণতার জন্য এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

উল্লেখ্য যে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর প্রথমে ঈমান আনেন, তাঁরা নদী-তীরের মৎস্যজীবি ছিলেন না, তাঁরা মিশরের পরাধীন ও গোলাম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন একটি আযাদ জাতির লোক। সে জাতি বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে সুপরিচিত ছিল এবং তারা সৃষ্টির শুরু থেকে সে সময় পর্যন্ত কখনো কারো আনুগত্য করেনি। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইরান, সিরিয়া, মিশর ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের মধ্যে এমন লোক ছিলেন, যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও মেধার প্রমাণ আজো আমাদের সামনে বর্তমান আছে।

তাদের মধ্যে এমন লোক ও ছিলেন, যারা বিরাট সেনা-বাহিনীর মুকাবিলা করে বিজয়ী হন এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত হন। তাদের মাঝে এমন লোক ও ছিলেন, যারা বিরাট দেশের উপর শাসন চালান এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ দেন। এঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতিটি কাজকর্ম অনুসরণ করেন এবং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসৃতিকে নিজেদের জন্য বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। এটি ও তাঁর মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতাতার অকাট্য ও জ্বলন্ত প্রমাণ।

স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো তাঁর কোন অবস্থা ও জীবনের কোন ঘটনা গোপন রাখার চেষ্টা করেননি। তিনি যেভাবে জীবন যাপন করতেন, তা সবার নিকট প্রকাশ্য ছিল এবং আজো আছে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হযরত আয়েশা (রা) নয় বছর তাঁর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। তিনি বলেন ঃ

'যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলীর মধ্য থেকে কিছু

লুকিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ করেননি, তোমরা তাকে সত্যবাদী বলে মনে করো না।' (সহীহ বুখারী বর্ণিত)।

কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

অর্থ : "হে রাসূল! আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু আপনার উপর নাযিল হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে তো তাঁর পয়গাম পৌছালেন না।"[৪]

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার কোন ব্যক্তিই তার সামান্যতম দুর্বলতার কথা ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায় না। বিশেষ করে যে ব্যক্তি কোন একটি জামাতের নেতৃত্ব দেয় এবং তাও আবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, সে কখনো এ কাজে ব্রতী হয় না।

কিন্তু কুরআন মযীদে এমন অনেক আয়াত আছে, যে গুলিতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাহ্যিক ছোট-খাট ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তিনি কুরআনের প্রতিটি আয়াত পাঠ করে লোকদের শুনিয়েছেন। লোকেরা তা মুখস্থ করেছে। প্রত্যেকটি মসজিদে ও মেহরাবে সেগুলির আবৃত্তি হয়েছে। আর আজো যেখানে মুহাম্মদ (স.)-এর নাম পরিচিত, সেখানে তাঁর অনুসারীদের এগুলিও উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ এ মামুলী ভ্রান্তিগুলির উল্লেখ যদি কুরআনে না থাকতো তাহলে আজ দুনিয়ার মানুষ এগুলির কথা জানতেই পারতো না। কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি বস্তুরই প্রকাশ্য দিবালোকে আসার প্রয়োজন আছে এবং তাই হয়েছে।

প্রনিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পোষ্যপুত্র যায়দের স্ত্রীকে বিয়ে করেন যা তৎকালীন আরবদের নিকট আপত্তিকর ছিল। আল্-কুরআনে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন:

'রাসূলুল্লাহ (স.) যদি আল্লাহ্র নাযিলকৃত কোন আয়াত গোপন রাখতে

৪. আল্-কুরআন; সূরা মায়িদাহ-৫; আয়াত : ৬৭।

পারতেন, তাহলে অবশ্যই এ আয়াতকে লুকিয়ে রাখতেন, যে আয়াতে বিয়ের কথা উল্লেখ আছে।' (মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)।

এর ফলে অজ্ঞ লোকদের অনর্থক প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগই থাকতো না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা করেননি। এ থেকে প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের কোন অংশ প্রচ্ছন্ন বা গোপন নেই।

এ ব্যাপারে 'বাসওয়ার্থ স্মিথের' সাক্ষ্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন :

"এখানে সব কিছুই উজ্জ্বল দিবালোকে পরিস্ফুট। এ আলোক প্রতিটি বস্তুর ওপর পড়েছে এবং প্রতিটি বস্তু পর্যন্ত তা পৌঁছতে পারে। আসলে ব্যক্তি জীবনের গভীরতম অঞ্চল চিরকাল আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু আমরা মুহাম্মদের বাহ্যিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত। তাঁর যৌবন, তাঁর নবূওত প্রাপ্তি, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা এবং এর ক্রম-উন্নতি, তাঁর উপর ওহীর অবতরণ, তাঁর মিশন ঘোষিত হবার পর একখানা কিতাব (কুরআন) আমাদের কাছে আছে। এ কিতাবটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে সংরক্ষিত থাকার এবং অবিন্যস্ত বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এ কিতাবের আভ্যন্তরীণ সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।"

ঐতিহাসিক 'গীবন' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"প্রথম যুগের কোন পয়গম্বর সত্যতার এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেমন মুহাম্মদ উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বপ্রথম তিনি এমন সব লোকের সামনে নিজেকে নবী হিসেবে পেশ করেন, যারা মানুষ হিসেবে তাঁর যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ছিল। যারা তাঁকে সব চাইতে বেশী জানতেন, যেমন তাঁর স্ত্রী, তাঁর গোলাম, তাঁর চাচাতো ভাই, তাঁর সব চাইতে পুরাতন বন্ধু; যার সম্পর্কে মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন যে,

'একমাত্র সেই বন্ধুই কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি এবং কখনো শংকিত হয়নি, এসব লোকই সর্ব প্রথম তাঁর অনুসারী হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত: নবীদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, মুহাম্মদের ব্যাপারে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। যারা

তাঁকে জানতো না, তারা ছাড়া অন্যদের কাছে তিনি অখ্যাত ছিলেন না।'

উল্লেখ্য যে, তাঁকে সর্বপ্রথম তারাই মেনেছেন, যাঁরা তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও অভ্যাস সমূহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিল এবং তাঁরা সবাই নিজেদের ঈমান ও আকীদার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হযরত খাদীজা (রা) তিন বছর পর্যন্ত 'শা'বে আবু তালিব' নামক উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে ক্ষুধা, অনাহার ও অর্ধাহারের সম্মুখীন হতে হয়। যখন চারদিক থেকে শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করছিল, তখন রাতের অন্ধকারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁর সহযাত্রী হন। হযরত আলী (রা.) এমন বিছানায় শয়ন করেন, যা পরদিন সকালে রক্তে-রঞ্জিত হওয়ার ছিল। হযরত যায়েদ (রা) এমন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি পিতার সন্ধান পাবার জন্য তার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নিজের আধ্যাত্মিক পিতাকে ত্যাগ করেননি। 'ক্যাডফ্রে হেগেন্স'– 'এ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ' গ্রন্থে বলেছেন :

'খৃষ্টানরা যদি একথা মনে রাখে, তাহলে খুবই ভাল হবে যে, মুহাম্মদের পয়গাম তাঁর অনুসারীদের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করেছিল, যা যীশুর প্রথম যুগের অনুসারীদের মধ্যে সন্ধান করা অর্থহীন। যীশুকে যখন শূলদন্ডের উপর চড়ানো হয়, তখন তাঁর অনুগামীরা তাঁকে ফেলে পলায়ন করে। তাদের ধর্মীয় নেশা টুটে যায় এবং তারা তাদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুর কবলে শৃংখলিত রেখে সরে পড়ে।

অপরদিকে মুহাম্মদ (স.)-এর অনুসারীরা তাদের মজলুম নবীর চারদিকে সমবেত হয়, তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জানমাল বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করে তাঁকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করে।' (উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৬৬-৬৭, ১৮৭৩ সালে বেরি থেকে মুদ্রিত)।

উল্লেখ্য যে, "ওহোদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী যখন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর উপর একযোগে হামলা করে এবং মুসলিম বাহিনীর সারিসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, তখন তিনি আওয়াজ দেন :

'কে আমার জন্য জীবন দেবে?' এ আয়াজ শোনার সাথে সাথেই সাতজন আনসার এগিয়ে আসেন এবং তারা সকলে বিপুল বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হন।'

এ যুদ্ধে জনৈক আনসার মহিলার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর ন্যায় প্রিয়জন শহীদ হন। পরপর এ তিনটি হৃদয় বিদারক সংবাদ মহিলাটি শোনেন এবং জিজ্ঞাসা করতে থাকেন :'আমার প্রিয় রাসূল (স.) কেমন আছেন?' লোকেরা বলে : তিনি নিরাপদে আছেন। এ সত্ত্বেও তিনি ছুটতে ছুটতে ওহোদ প্রান্তরে হাজির হয়ে তাঁর চেহারা দেখে বলে উঠেন :

كل مصيبة بعدك جلل يارسول الله .

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিরাপদে থাকলে সকল বিপদই তুচ্ছ!" (সুবহানাল্লাহ!)

উল্লেখ্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন মুসলমানের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই এ আদর্শের সকল দিক সবার সামনে থাকা দরকার এবং তা সামনে আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর জীবনের কোন একটি বিষয় ও লুপ্ত হয়ে যায়নি। কোন একটি ঘটনাও পর্দার অন্তরালে নেই। তাঁর জীবনের সবকিছুই ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তাই বলা যায়, যে জীবনের প্রত্যেকটি দিক এমনি উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল, একমাত্র সে জীবনটিই সব মানুষের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়।

একদা জনৈক ইহুদী একজন সাহাবীকে ব্যাঙ্গ করে বলেছিল ঃ

'তোমাদের নবী তোমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন এবং সাধারণ ও মামুলি কথা ও শিক্ষা দেন।' জবাবে সাহাবী স্বগর্বে বলেছিলেন :

'অবশ্যই আমাদের নবী আমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষা দান করেন। এমন কি তিনি আমাদের ইস্তেঞ্জা ও হস্ত প্রক্ষালনের শিক্ষাও দেন।' আর আজো আমরা সেই পূর্ণাংগ শিক্ষামূলক জীবনকে গর্বের সাথে বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করি। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন যেন দুনিয়ার গৃহ-মুকুর।

এর মধ্যে নিজের দেহ-আত্মা, ভেতর-বাইর, কথা-কাজ, জিহ্বা-হৃদয়, রসম-রেয়াজ, নিয়ম-পদ্ধতি, চাল-চলন প্রভৃতির প্রতিফলন দেখে প্রত্যেক ব্যক্তি সেগুলির সংস্কার ও সংশোধন করতে পারে।

আর এজন্যই মুসলিম জাতি নিজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিকতা ও নৈতিকতার জন্য তার ধর্মের ও তার রাসূলের জীবনের বাইরে থেকে পৃথক

কিছু চায় না। চাওয়ার কোন প্রয়োজন ও হয় না।

বস্তুত এরূপ ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার সাথে কোন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন দুনিয়ার সামনে বিদ্যমান নেই, তাই সমগ্র মানব জাতির জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ এবং এহেন পরিপূর্ণ ও আবরণহীন জীবন-ই সমস্ত মানবজাতির জন্য আদর্শ হতে পারে।

নবী জীবনের সার্বজনীনতা

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি-চরিত্রে মানব সমাজের সফল গোষ্ঠী শ্রেণীর বিভিন্ন ধরণের জীবন যাত্রার প্রকাশ ঘটেছে এবং যেখানে সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব ও পূর্ণাংগ নৈতিকতার সমাবেশ দেখা যায়, তা হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাল্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন।

যেমন– যদি তুমি ধনী হয়ে থাক, তবে মক্কার ব্যবসায়ী ও বাহরাইনের অর্থশালির অনুগামী হও; যদি তুমি গরীব হয়ে থাক, তাহলে আবু তালিব গিরি সংকটের বন্দী ও মদীনার প্রবাসীর অবস্থা শ্রবণ কর। যদি তুমি বাদশাহ্ হয়ে থাক, তাহলে আরবের মুকুটহীন সুলতানের ইতিবৃত্ত পাঠ করো। যদি প্রজা হয়ে থাক, তাহলে কুরাইশদের অধীনস্তকে এক নজর দেখ। যদি বিজয়ী হয়ে থাক, তাহলে বদর ও হোনায়েনের সিপাহসালাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আর যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাক, তাহলে ওহোদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

আর যদি তুমি শিক্ষক হও, তাহলে 'সুফ্ফার শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি ছাত্র হয়ে থাক, তবে জিব্রীলের সামনে উপবেশনকারীর দিকে তাকাও। যদি বক্তৃতা ও উপদেশদানকারী হয়ে থাক, তাহলে মদীনার মসজিদে মিম্বারের ওপর দ-ায়মান ব্যক্তির কথা শোন। আর যদি তুমি নি:সংগ ও অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর দায়িত্ব পালন করতে চাও, তাহলে মক্কার সহায়-সম্বলহীন নবীর আদর্শ তোমার জন্য আলোকবর্তিকার কাজ করবে। যদি তুমি আল্লাহ্র অনুগ্রহে শত্রুদের পরাজিত ও বিরোধীদের দুর্বল করতে সক্ষম হয়ে থাকো, তাহলে মক্কা-বিজয়ীর অবস্থা দেখো। যদি তুমি নিজের কারবার এবং পার্থিব বিষয়াদীর ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে চাও, তাহলে বনী-নযীর, খয়রব ও ফিদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিকের

কাজ-কারবার ও ব্যবস্থাপনা দেখো।

আর যদি তুমি এতিম হয়ে থাক, তাহলে আবদুল্লাহ ও আমেনার কলিজার টুকরাকে ভুলো না। যদি শিশু হয়ে থাক, তাহলে হালীমা সাঈদার আদরের দুলালকে দেখ, যদি যুবক হয়ে থাক, তাহলে মক্কার মেষপালকের জীবনী পাঠ কর, যদি ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী হয়ে থাক, তাহলে বসরা সফরকারী দলের অধিনায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। যদি আদালতের বিচারক ও পঞ্চায়েতের বিবাদ মীমাংসাকারী হয়ে থাক, তাহলে কাবাঘরে সূর্যকিরণ প্রবেশের আগে এতে প্রবেশকারী এবং 'হাজ্‌রে আসওয়াদকে' পুন:স্থাপন জনিত বিবাদ মীমাংসাকারীকে দেখ। মদীনার কাঁচা মসজিদের বারান্দায় উপবেশনকারী বিচারকের দিকে নজর করো, যাঁর দৃষ্টিতে বাদশাহ-ফকীর ও আমীর-গরীব সব সমান ছিল।

যদি তুমি স্বামী হয়ে থাক, তাহলে তুমি খাদীজা (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মহান স্বামীর পবিত্র জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি তুমি সন্তানের পিতা হয়ে থাক, তাহলে ফাতিমা (রা)-এর পিতা ও হাসান ও হোসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞাসা করো।

বস্তুত: তুমি যাই হওনা কেন এবং অবস্থায়ই থাকো না কেন, তোমার জীবনের জন্য আদর্শ, তোমার চরিত্রের সংশোধনের উপকরণ, তোমার অন্ধকার গৃহের জন্য আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক জীবন-আদর্শের মধ্যে সর্বক্ষণ ও প্রতিমূহূর্তে পাওয়া যেতে পারে। তা মানব-শ্রেণীর প্রতিটি অনুসন্ধানকারী ও ঈমানী আলোকের প্রত্যেক সন্ধানীর জন্য একমাত্র মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনই হিদায়েতের উৎস ও নাজাতের মাধ্যম।

মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় আওয়াজ এলো:

'মুহাম্মদ (স.)-কে দেশে ঘুরিয়ে আনো এবং সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যাও, যেন সমস্ত দুনিয়া তার ও নিশানা চিন্তে পারে। জ্বিন-ইনসান, পশু-পাখী প্রত্যেক প্রাণীর সামনে তাঁকে নিয়ে যাও। তাঁকে আদমের ব্যবহার শীসের তত্ত্বজ্ঞান,

নূহের সাহসিকতা, ইব্রাহীমের বন্ধুত্ব, ইসমাঈলের বাকশক্তি ইসহাকের সন্তুষ্টি, সালেহের মধুর ভাষণ, লূতের হিকমত, মুসার কঠোরতা, আইয়ূবের সবর, ইউনুসের আনুগত্য, ইউশার জিহাদ, দাউদের কণ্ঠ দানিয়ালের প্রেম, ইলিয়াসের গাম্ভীর্য, ইয়াহ্ইয়ার চারিত্রিক পবিত্রতা ও ঈসার কৃচ্ছ্র সাধনা দান কর এবং সব পয়গম্বরের চরিত্রের মধ্যে তাকে নিমজ্জিত কর।'

উল্লেখ্য যে, যে সব আলিম এ হাদীসটিকে তাদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে– ইসলামের পয়গম্বরের সর্বব্যাপক গুণাবলীকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণকে পৃথক পৃথকভাবে যা কিছু দান করা হয়েছিল। তা সব একত্রিত করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছিল।

স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন-চরিতকে অন্যভাবে পেশ করা যায়। যেমন– দুনিয়াতে দুই ধরনের শিক্ষায়তন আছে। এক ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল এক একটি বিষয়ের শিক্ষাদান করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক ও স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন– মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্ট স্কুল, বাণিজ্য শিক্ষাকেন্দ্র, কৃষি-কলেজ, আইন কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার বের হবে। কৃষি কলেজ থেকে কেবল কৃষি বিশেষজ্ঞ বের হবে। আইন কলেজ থেকে আইনবিদ বের হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাকেন্দ্রে কেবল ব্যবসা-বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হবে। বিদ্যা ও শিল্পকেন্দ্র থেকে কেবল বিদ্যান ও শিল্পীর উদ্ভব হবে। ক্যাডেট কলেজ থেকে কেবল উচ্চ শ্রেণীর সিপাহী তৈরী হবে। এভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন চলতে থাকবে।

আবার কোথাও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকে। এগুলো দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দান করা হয়। তাদের পরিচালনাধীনে, মেডিকেল কলেজ থাকে, আবার শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র থাকে, কৃষি ও প্রকৌশল বিদ্যালয় থাকে, আবার মিলিটারী স্কুল ও থাকে। এরপর সেখান থেকে সেনাবাহিনীর জেনারেল ও সিপাহী, আদালতের জজ ও আইনবিদ, ব্যবসায়ী ও হিসাব-বিশারদ, ডাক্তার, শিল্পী ও শিল্প-বিশেষজ্ঞ সবই সৃষ্টি হয়।

বস্তুত: একই ধরণের শিক্ষা, একই ধরণের শিল্প ও একই ধরনের বিদ্যা

আহরণ করলে তার মাধ্যমে মানব সমাজে পূর্ণতা আসতে পারে না; বরং এর সবগুলি একত্রিত হলে তবেই মানব সমাজ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। যদি কেবল একটি বিদ্যা ও একটি শিল্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা দুনিয়া ভরে যায়। তাহলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারখানা মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের যাবতীয় কাজ-কারবার নিমিষেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমনকি সারা বিশ্ব যদি নির্জনবাসী কৃচ্ছ্র সাধনাকারীদের দ্বারা ভরে যায়, তাহলেও দুনিয়ায় পরিপূর্ণতা আসবে না।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন নবীর জীবনকে আমরা এ মানদণ্ডে যাঁচাই করতে পারি। হযরত ঈসা (আ.)-এর কথায় বলা যায়, 'ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।' আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আধ্যাত্মিক সন্তান ও ছাত্রদের মাধ্যমে। নবীগণ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন, সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রথমে কোথাও দশ-বিশ জন, কোথাও ষাট-সত্তর জন, কোথাও একশো-দুইশো জন, কোথাও হাজার-দুই হাজার, আবার কোথাও পনের-বিশ হাজার ছাত্র পরিলক্ষিত হবে।

কিন্তু নবূওত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে একই সময় এক লক্ষের ও বেশী ছাত্র ছিল।

উপরন্তু অন্যান্য নবীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিষয় যদি জানতে চাওয়া হয় যে, তাদের বসবাস কোথায় ছিল, তাদের পরিচয় কি, তারা কিভাবে তৈরী হয়েছিল, তাদের আচার-ব্যবহার, আধ্যাত্মিক অবস্থা কেমন ছিল, এবং তাদের শিক্ষা ও অনুশীলনের বাস্তব ফলশ্রুতি কি? তাহলে এর কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি বিষয় আপনি জানতে পারেন। এর প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবন-চরিত, শিক্ষা ও অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বিষয় ইসলামের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

উল্লেখ্য যে, নবূওত ও ধর্মের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরূপ দাবী করে যে, এর দুয়ার সবার জন্য খোলা আছে। কিন্তু আসলে তা সত্য নয়।

যেমন– তাওরাতের সকল নবী ইরাক, সিরিয়া অথবা মিসর দেশের সীমা পার

হননি। অর্থাৎ তাঁরা তাদের নিজের দেশে যেখানে থাকতেন, সেখানেই তাঁদের কর্ম-তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিজেদের গোত্র ও বংশ ছাড়া অন্যকে তাঁরা দাওয়াত দেননি। আর তাঁদের প্রচেষ্টার কেন্দ্র ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল বনী ইসরাঈল বংশ। আরবের প্রাচীন নবীগণ ও তাঁদের নিজেদের জাতির দায়িত্বই গ্রহণ করতেন। তারা কেউ বাইরে বের হননি।

স্মর্তব্য যে, যীশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও অ-ইসরাঈল ছাত্রদের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি কেবল ইসরাঈলদের হারানো মেষগুলির সন্ধানে ছিলেন। (মোতিঃ ৭ম অধ্যায় : ২৪ আয়াত)।

আর তিনি অন্য জাতির লোকদের শিক্ষা দান করে "শিশুদের রুটি কুকুরের মুখে" নিক্ষেপ করাকে পছন্দ করতেন না। (ইন্‌যিল বর্ণিত)।

ভারত বর্ষের দ্বীনের-আহ্বায়করা 'পবিত্র-আর্যবত্যের বাইরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। যদিও গৌতম বুদ্ধের অনুসারী রাজাগণ তাঁর বাণীকে বাইরের জাতিদের কাছে পৌঁছে দেন। আর এটা তারা খৃষ্টানদের দেখে করেছিল। এসব ধর্মের প্রচারকদের নিজের জীবন ও চরিত্রে সার্বজনীনতা ও বিশ্ব জনীনতার দৃষ্টান্ত নেই।

পক্ষান্তরে, উম্মী-নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব ছাত্রের পরিচয় জানা যায়। মেযন– আবু বকর (রা,) উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), তাল্‌হা (রা), যুবাইর (রা) প্রমুখ ছাত্ররা ছিলেন কুরাইশ বংশের। আবূ যার (রা) ও আনাস (রা) ছিলেন মক্কার বাইরের তাহামা এলাকার গিফার গোত্রের লোক।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও তোফায়েল ইবন আমর (রা) ছিলেন ইয়মেন দেশের দুসী গোত্রের লোক। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) ও মায়াজ ইবনে জাবাল (রা), এঁরাও ছিলেন ইয়ামন দেশের অন্য গোত্রের লোক। যিয়াদ ইবনে সা'লাবা (রা) ছিলেন ইয্‌দু গোত্রের লোক। খাব্বাব ইবন ইরতাদ (রা) ছিলেন তামীম গোত্রের লোক। মুনবাজ ইবন জাম (রা) ও মানযার ইবনে আসাদ (রা) ছিলেন বাহ্‌রাইনের লোক। হযরত বেলাল (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী এবং সহায়ব (রা) আসেন রোম থেকে। সালমান ফারসী (রা), ফিরোজ দায়লামী (রা) ও মারকাবুদ (রা) ছিলেন

ঈরানের অধিবাসী।

উল্লেখ্য যে, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে হোদায়বিয়ার সন্ধি এমন একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে, যা ইসলামের আসল উদ্দেশ্যের পরিপূরক বিবেচিত হয়। যা ছিল– কুরাইশ ও মুসলমান উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মুসলিমরা যেখানে, যেভাবে ইচ্ছা তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারবে।

সেমতে তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে সকল সুলতান ও রাষ্ট্র প্রধানদের নামে ইসলামী দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠান এবং তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছে দেন।

যেমন– দেহিয়া কাল্‌বী (রা) রুমের কায়সার হিরাকিলের দরবারে, আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজের দরবারে, হাতিব ইবন বাল্‌তায়া (রা) মিসরের গভর্নর মুকাত্তকাসের দরবারে, আমর ইবন উমাইয়া (রা) আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্‌জাশীর দরবারে, সুজা ইবন দাহাবুল আসাদী (রা) সিরিয়া প্রধান হারেস গাম্‌সানীর দরবারে এবং সালীত ইবন আমর (রা) ইয়ামামার প্রধানগণের নিকট রাসূলূল্লাহ (স.)-এর এ পত্র বহন করে নিয়ে যান যে, তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদে নববীর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত।

এ আলোচনা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায়তনের সার্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তার মধ্যে প্রবেশের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ ও রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ এবং ভাষা ও উচ্চারণ-ভঙ্গিমার কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং তার দরজা দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর জন্য উন্মুক্ত ছিল।

উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা (আ.)-এবং শিক্ষায়তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে কেবল সিপাহী, ইউশার ন্যায় সেনানায়ক ও বিচারপতি এবং কতিপয় পদাধিকারী পাওয়া যায়।

আর ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ফিলিস্তিনের গলি পথে রয়েছে কতিপয় কৃচ্ছ্র সাধনাকারী ফকির।

পক্ষান্তরে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায়তনে রয়েছেন : আবিসিনিয়ার নাজজাসী বাদশাহ আসমাহা (রা), মায়ানের প্রধান ফারদা

(রা); হামীরের প্রধান যুলকেলা (রা), ইয়ামনের প্রধান ফিরোজ দায়লামী (রা)।

আর অন্য দিকে রয়েছেন : বেলাল (রা); ইয়াসার (রা); সুহাইব (রা), খাব্বাব (রা), আম্মার (রা) ও আবু ফকীহা (রা) এর ন্যায় গোলাম এবং সুমাইয়া (রা), লোবীয়া (রা), নাহদীয়া (রা) ও উম্মে উবাইস (রা)-এর মত বাদীগণ। এখানে আমীর-গরীব, বাদমাহ-ফকির, প্রভু-ভৃত্য সবাইকে এক সারিতে দণ্ডায়মান দেখা যায়।

তাঁর শিক্ষাগার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়েছেন একদিকে-বুদ্ধিজীবিগণ, প্রকৃতির গভীর রহস্যজ্ঞানী, দেশ-শাসক ও পরিচালকগণ। যেমন, আবু বকর সিদ্দীক (রা), উমর ফারুক (রা), উসমান গণী (রা), আলী মুর্তজা (রা), মুয়াবীয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)। এঁরা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, আফ্রিকা থেকে ভারত বর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূখন্ড শাসন করেছেন এবং এমনভাবে রাজ্য-পরিচালনা করেছেন যে, তাঁদের সামনে বড় বড় শাহান শাহ ও শাসকগণের রাজনীতি, কূটনৈতিক কার্যক্রম ও শাসন-শৃঙ্খলা বিধান সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্প্রভ ও বাতিল হয়ে যায়। তাঁদের ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার সম্পর্কিত রায়সমূহ ঈরানী শাসনতন্ত্র ও রোমীয় আইনকে প্রভাবহীন করে দেয় এবং দুনিয়ার রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এমন স্থান অধিকার করে, যার কোন নজীর পেশ করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে আছেন-খালিদ ইবনে ওলীদ (রা), সায়াদ ইবন আবী ওয়াককাস (রা), আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা) ও আমর ইবনে আসা (রা)। যাঁরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জালিম, পাপাশক্ত ও মানবতার জন্য অভিশাপস্বরূপ পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি বিশাল সাম্রাজ্যকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে তাঁরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনা-নায়ক ও বিজয়ী প্রমাণিত হন।

তাঁদের বিজয় অভিযানের বাহিনী আজো মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। সায়াদ (রা) ইরাক ও ঈরানের রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে ইসলামের পদতলে নিক্ষেপ করে। খালিদ (রা) ও আবু উবায়দা (রা) রোমীয়দেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডের আমানত মুসলমানদের নিকট সোপর্দ করেন। আমর ইবনে আস (রা) ফেরাউনের দেশ নীলনদীর অববাহিকা রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ও ইবনে আবী সারাহ (রা), আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড শত্রুদের থেকে ছিনিয়ে নেন। এই বিশ্ববিশ্রুত বিজয়ী ও সেনা-নায়কগণের যোগ্যতা শুধু ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃতিই লাভ করেনি, বরং ইতিহাস তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ ও পেশ করেছে।

তৃতীয় দিকে– বাযান (রা), খালিদ (রা), ইবনে সাঈদ (রা), মুহাজির (রা), ইবনে উসাইয়া (রা) কান্দা, যিয়াদ (রা) ও ইবনে লবীদ (রা) (হাযার মউত); ইয়াযীদ (রা) ও ইবনে আবী সুফিয়ান (রা) (নাজরান)। এ আলা (রা), ইবনে হাযরামী (রা)- (বাহরাইন) প্রমুখ অসংখ্য সাহাবী সাফল্যজনকভাবে বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ শাসন করে এবং খোদার সৃষ্ট জীবকূলের জীবন সুখ-শান্তিতে ভরপুর করে তোলেন।

চতুর্থ দিকে আছেন : উলামা ও ফকীহ্গণের দল। যেমন– উমর ইবনে খাত্তাব (রা); আলী ইবনে আবী তালিব (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত উম্মে সালমা (রা), উবাই ইবনে কাব (রা)। মুযায ইবনে জাবাল (রা), যায়েদ ইবন সাবিত (রা), ইবনে যুবাইর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলামী ফিকাহ ও আইন শাস্ত্রের ভিত রচনা করে দুনিয়ার আইন প্রণেতাগণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেন।

পঞ্চম সারিতে আছেন সাধারণ হাদীস সংকলনকারী ও ইতিহাস রচয়িতাগণ। যেমন– আবূ হোরায়রা (রা), হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), হযরত আনাস ইবন মালিক (রা), হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) প্রমুখ অসংখ্য সাহাবী। যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও ঘটনাবলী সংগ্রহ ও বর্ণনা করেন।

সাহাবীদের ষষ্ঠ দলটিতে আছেন সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফা মসজিদে নববীর উঠান ছাড়া তাঁদের মাথা গুঁজবার দ্বিতীয় কোন স্থান ছিলনা। দেহের সাথে জড়ানো কাপড়টি ছাড়া দুনিয়ায় তাঁদের মালিকানায় আর কোন কিছুই ছিলনা। তাঁরা দিনের বেলা জংগলে গিয়ে কাঠ কেটে আনতেন এবং তা বিক্রি করে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন এবং তা থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় দান ও করতেন এবং রাতের বেলা আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতেন।

সাহাবীদের আর একটি দল হচ্ছে শহীদ ও নিরপরাধ নিহত ব্যক্তিদের। তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে তাঁদের প্রিয় জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তবুও সত্যের সংগ ত্যাগ করতে সম্মত হননি।

যেমন– হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রথম স্বামীর পুত্র 'হালা'-কে তলোয়ার দ্বারা কেটে কুচি কুচি করা হয়। হযরত আম্মার (রা) এর মাতা সুমাইয়া (রা) আবু জেহেলের বর্শার আঘাতে শহীন হন। হযরত ইয়াসার (রা) কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করেন। হারাম ইবনে মালহাম ও তাঁর ৭০ জন সাথী বীরে মাউনায় রেহেল ও যাকওয়ান উপজাতিদ্বয়ের হাতে নির্দয়ভাবে শাহাদত বরণ করেন। ৭ম হিজরীতে ইবনে আবী-জার (রা) ৪৯ জন সাহাবীসহ বনু-সালীমের হাতে শহীদ হন।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার একটি বহু পরিচিত ধর্ম মাত্র একটি শূল-বিদ্ধ মৃত্যুকে নিয়ে গর্ব করে, কিন্তু ইসলামের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে অসংখ্য শূল-বিদ্ধ মৃত্যু, নির্মম হত্যা এবং শত-শত কুরবানীগাহের নীরব স্বাক্ষী আজো বিরাজমান।

বস্তুত: তরবারী ও বর্শার আঘাত অথবা শূলদণ্ড এগুলো সাময়িক কষ্ট। কিন্তু সত্যানুসারীদের জীবন এর চাইতে অধিক দৃঢ়তা এবং এর চাইতে অধিক সবর ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ একমাত্র সত্যেরই কারণে তাঁরা বছরের পর বছর দু:খ-কষ্ট সহ্য করেন। তাঁরা জ্বলন্ত-আগুনের অগ্নি-শিখা ও উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুয়ে থাকতেন এবং বড় বড় পাথর-খণ্ড তাঁদের বুকের ওপর রাখা হতো। তাঁদের গলায় দড়ি বেঁধে টানা হয়, তবু ও বার বার মুহাম্মদ (স.)-এর কালিমা তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয়।

'আবু তালেব গিরিসংকটে' অবরুদ্ধ থাকা অবস্থা তারা 'তালাহ' বৃক্ষের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করেন। সায়াদ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা) বলেন : 'এক রাতে ক্ষুধার তাড়নায় একটা শুকনো কাপড় পেয়ে সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে পানি মিশিয়ে খেয়ে ফেলি।'

'আম্বাসা ইবনে গায্ওয়ান (রা) বলেন : 'আমরা সাত জন মুসলমান ছিলাম। অনভ্যস্ত খাদ্য খেয়ে আমাদের ঠোঁট ও জিভের চামড়া জখম হয়ে গিয়েছিল।'

যখন হযরত খাব্বাব (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন কাফিররা তাঁকে জ্বলন্ত

কয়লার উপর শুইয়ে দেয় এবং তাঁর শরীবের চর্বি গলে গলে এ আগুন নিভে যায়।

হযরত বেলাল (রা) কে দুপুরের উত্তপ্ত মরু বালুকার উপর শুইয়ে দেয়া হতো এবং তাঁর বুকের উপর রাখা হতো বড় বড় পাথর-খন্ড। আর তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে গলিতে গলিতে টেনে নেয়া হতো। এ সময় তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো– আহাদ, আহাদ।

হযরত আবূ ফকীহা (রা)-এর পায়ে দড়ি বেঁধে পথে পথে ঘুরানো হতো এবং তাঁর গলা টিপে ধরা হতো। তাঁর বুকের উপর এত বড় পাথর রাখা হতো যে তাঁর জিভ বেরিয়ে যেতো। হযরত যুবায়ের (রা)-কে তাঁর চাচা চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকের মধ্যে ধোঁয়া প্রবেশ করাতো। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) কে দড়ি দিয়ে প্রহার করা হতো। হযরত উসমান (রা)-কে তাঁর চাচা দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করতো।

উল্লেখ্য যে, এসব কিছু সংঘটিত হচ্ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে নেশায় তাঁরা বিভোর হয়েছিলেন, তার ঘোর কাটতে চাচ্ছিল না। এ ছিল কেমন নেশা? এ ছিল কাওসারের পানি, আর যিনি তা পান করাচ্ছিলেন, তাঁর চিরন্তন পানশালার পানীয় পানের নেশা।

চিন্তার বিষয় হলো, এরা ছিল সেই বর্বর মূর্তি পূজারী ও আরব জাতি! এদের মধ্যে একি বিপ্লব সংঘটিত হলো? এক নিরক্ষর নবীর শিক্ষা মূর্খ আরবদের বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ চিন্তা ও হৃদয়ের অধিকারী এবং আইনবিদে পরিণত করলো কেমন করে?!

এক নিরস্ত্র পয়গম্বরের আবেগময় প্রচার কিভাবে দুর্বল আরবদেরকে সেনা-নায়ক ও বীর যোদ্ধায় পরিণত করে নতুন শক্তি ও শৌর্য-বীর্যে ভরপুর করে তুললো! যারা আল্লাহ্‌র নাম জানতো না। তারা আবার কেমন করে রাত্রি জাগরণকারী সাধক, মুত্তাকী ও আনুগত্য শীলে পরিণত হলো! এঁরা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায়তন বা মদীনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখানে সব ধরণের ছাত্র ছিল।

যেমন– তাঁদের মধ্যে ছিল আলিম, আইন-প্রণেতা, সিপাহী, জেনারেল, আদালতের বিচারক, শাসক ও গভর্নর, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, বাদশাহ ও

আমীর, মনিব ও গোলাম, যোদ্ধা ও সত্যের পথে শাহাদাত বরণকারী। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদ (স.)-এর মধ্যে মানবিক গুণাবলীর যোগ্যতা ও শক্তির যে পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল, এটা ছিল তারই প্রকাশ। আর এ সমস্তই ছিল তাঁর সার্ব-জনীন গুণাবলীর বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ।

বস্তুত: এসব গুণাবলী সিদ্দীক ও ফারুকরূপে প্রদীপ্ত হয়েছে, কখনো যুন্নুরাইণ ও মুর্তজার রূপ ধারণ করেছে, কখনো খালিদ ও আবূ উবায়দা এবং কখনো সায়াদ ও জাফররূপে হাজির হয়েছে; কখনো ইবনে উমর ও আবূ যার এবং সালমান ও আবূ দারদারূপে মসজিদে ও মেহরাবে দেখা গেছে। আবার কখনো তা ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবন কাব এবং যায়েদ ইবন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদরূপে জ্ঞান ও শিক্ষার আয়তনে এবং বুদ্ধি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অংগণের রূপ ধারণ করেছে।

আবার তা কখনো বেলাল, সোহায়েব এবং আম্মার ও খোবাইবের পরীক্ষাগৃহে হৃদয় ও আত্মার সান্ত্বনার বাণী হয়েছে। মূলকথা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব ছিল বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী সূর্যের ন্যায়। যা থেকে সুউচ্চ পাহাড়, বালুকাময় মরুভূমি, প্রবাহমান স্রোতস্বিনী, শস্যশ্যামল ক্ষেত সবাই নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তাপ ও আলো সংগ্রহ করতো।

স্মর্তব্য যে, এ বৈচিত্র ও বিভিন্ন জনের যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয় সবার মধ্যেই সাধারণ ছিল। আর সেটি হচ্ছে– একই প্রকারের বিদ্যুৎপ্রবাহ বা রূহানী শক্তি, যা সকলকেই স্পন্দন দিচ্ছিল। একই জীবনীশক্তি সকলের বুকে চাঞ্চল্যময় ছিল।

যেমন- বাদশাহ ফকীর, আমীর-গরীব, শাসক শাসিত, বিচারক-সাক্ষী, সেনা-নায়ক-সিপাহী, শিক্ষক-ছাত্র, ইবাদতকারী, কৃচ্ছ্রসাধক ও ব্যবসায়ী, ধর্মযোদ্ধা অথবা শহীদ সবার মধ্যে তাওহীদের জ্যোতি, আন্তরিকতার প্রবাহ, ত্যাগের প্রেরণা, মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের বাসনা সবার মাঝে সক্রিয় ছিল। রুচি, প্রকৃতি ও পথের পার্থক্য ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ সবারই এক, একই কুরআন, একই রাসূল, একই কা'বাকে সকলেই মেনে চলতো। তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল– আল্লাহ্র যমীনে তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বস্তুত: এ দুনিয়া মানুষের রুচি-প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সামর্থ-বৈচিত্রে পরিপূর্ণ, তাই অনস্বীকার্য যে, মুহাম্মদ (স.)-এর সার্বজনীন ও সর্বগুণধারার ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কেউ মানুষের সর্বশেষ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন নেতা হতে পারে না। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থ : 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা পোষণের দাবী কর, তাহলে আমার আনুগত্য কর, তাহলেই আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালবাসবেন।[৫]

এ আয়াতে মুহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্য ও তাঁর জীবনের অনুসৃতিকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার মানদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে :

'যদি তোমরা রাজা-বাদশাহ হও, তাহলে আমার আনুগত্য কর। যদি তোমরা প্রজা হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি সিপাহ্‌সালারও সিপাহী হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি অধ্যাপক ও শিক্ষক হয়ে থাক, তবুও আমার আনুগত্য কর। ধনী হলেও আমার আনুগত্য কর এবং গরীব হলেও আমার আনুগত্য কর। আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী ও জাতির খাদেম হলেও আমার আনুগত্য কর।'

মোটকথা, তোমরা যে নেক বা ভাল পথই অবলম্বন কর এবং যত উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতম জীবন আদর্শের প্রত্যাশী হও, আমার আনুগত্যের ভেতর দিয়েই প্রকৃত আদর্শ লাভ করতে পারবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। (সুবহানাল্লাহ!)

৫. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩১।

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তব কর্মজীবন

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।'[৬]

উপরোক্ত আল্-কুরআনের আয়াতের আলোকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন ও চরিত্রের বাস্তব রূপ পেশ করার চেষ্টা করা হবে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা অন্য নবী ও ধমপ্রবর্তকদের জীবনের প্রায় সব অংশটুকুই শূন্য।

কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এ অধ্যায়টি সব চাইতে বিরাট ও বিস্ড়ৃত। নবীগণের নেতা ও সর্বশেষ নবীকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য এই একটি মানদ ই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য যে, সদুপদেশ মধুরবাণী ও উন্নত শিক্ষার অভাব এখানে নেই। অভাব হচ্ছে- প্রচারিত নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ ও প্রতিপালনের। বর্তমান ধর্মগুলির প্রবর্তক ও প্রচারকগণের জীবন-কথার সবটুকু পাঠ করলে সেখানে সুন্দর সুন্দর মতবাদ, মনোরম কাহিনী, বক্তাসুলভ বড় বড় দাবী, বক্তৃতার ঝড়, মুখরোচক ও সুবিন্যস্ত শব্দ প্রয়োগ এবং অত্যাধিক আবেগ ও উৎসাহ পাওয়া যাবে। চমৎকার উপমা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয় জয় করে নেবে। কিন্তু যে বিষয়টি সেখানে পাওয়া যাবে না, সেটি হচ্ছে- আমল; অর্থাৎ নিজের প্রচারিত নিষেধগুলি ও উপদেশাবলী সর্বপ্রথম নিজে পালন ও কার্যকরী করে দেখানো।

বস্তুত: মানুষের কর্মজীবনের নাম হচ্ছে- চরিত্র। কুরআন ছাড়া আর কোন ধর্মগ্রন্থ কি তার প্রবর্তকের পক্ষে এ সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, বাস্তব কর্মজীবনের মানদ ও তিনি উন্নততর মানুষ ছিলেন? আল্-কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেন :

---

৬. আল্-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ২১।

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থ : 'নিশ্চয় আপনার পারিতোষিক শেষ হবার নয়; আর অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৭]

এখানে 'আর' শব্দটি যদিও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে নিছক একটি অব্যয় পদ এবং তা পূর্বাপর দু'টি বাক্যকে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু আসলে আয়াতের অন্তর্নিহিত ইশারা ও বাক্য-সংযোজনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, একটি হচ্ছে ঘটনা এবং অন্যটি হচ্ছে তার কারণ। অর্থাৎ একটি হচ্ছে দাবী এবং অন্যটি হচ্ছে এর প্রমাণ। প্রথম বাক্যে তাঁর (মুহাম্মদ (স.)-এর) পারিতোষিক শেষ না হবার দাবী করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে এর স্বপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রকে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রই প্রমাণ করে যে, তাঁর পারিতোষিক কখনো শেষ হবার নয়। মক্কার উম্মী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে সবাইকে আহ্বান করেন, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থ : 'কেন তোমরা তা বল, যা তোমরা নিজেরা করো না।' এটা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই গর্হিত কাজ।[৮]

উল্লেখ্য যে, তিনি যা কিছু বলতেন, তাকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়ে দিতেন। যয়তুন পাহাড়ের বক্তা ও উপদেশদাতা হযরত ঈসা (আ.) এবং সাফা পাহাড়ের ধর্ম প্রচারক (মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন কাহিনী যাঁচাই করলে দেখা যাবে যে, একজনের জীবনে এর ছিটেফোঁটা ও নেই, আর অন্য জনের চরিত্রে তা পূর্ণরূপে বিরাজমান।

যেমন– শক্তিলাভ করার পর ক্ষমা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। কিন্তু কোন অক্ষম, দুর্বল ও শক্তিহীনের নিরবতাকে ক্ষমা ও ধৈর্য বলা যায় না। এক ব্যক্তি কাউকে আঘাত করেনি, কাউকে হত্যা করেনি, কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি, কারোর অর্থ লুট করেনি, কোন গৃহ নির্মাণ করিনি, কিছুই জমা করেনি। এসব কিছু হচ্ছে নৈতিবাচক গুণ।

---

৭. আল্-কুরআন, সূরা কলম, আয়াত : ৩-৪।

৮. আল-কুরআন, সূরা সাফ, আয়াত : ২।

এখন বলুন, সে কাউকে আঘাত করেনি একথা ঠিক, কিন্তু সে অভাবী ও দুর্বলের সাহায্য করেছে কি? কাউকে হত্যা করেনি, কিন্তু কারোর প্রাণ রক্ষা করেছে কি? কারোর অর্থ লুট করেনি, কিন্তু কোন গরীব ও অভাবীকে কিছু দান করেছে কি? নিজের জন্য কোন ঘর বানায়নি, কিন্তু কোন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে কি? নিজের জন্য কিছু জমা করেনি, কিন্তু অন্যকে কিছু দিয়েছে কি? পৃথিবীর প্রয়োজন এই ইতিবাচক গুণাবলীর এবং এরই নাম হচ্ছে বাস্তব কর্মজীবন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি তাদের জন্য কোমল (হে মুহাম্মদ)। আর যদি আপনি কঠোর হৃদয় হতেন, তাহলে অবশ্যই এরা, যারা আপনার চারপাশে জমা হয়েছে, তারা আপনার পাশ থেকে সরে যেত।'[৯]

এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোমল হৃদয়ের বর্ণনা; যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তিনি কোমল হৃদয় ও দয়ালু না হতেন, তাহলে এই বর্বর নির্ভীক ও উগ্র মেজাযের অধিকারী আরবেরা কোন দিন তাঁর চারপাশে জমায়েত হতো না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে একজন নবী এসেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তোমাদের উপকার করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত লোভী। তিনি ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র হৃদয়।'[১০]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর স্বকরুণ হৃদয়ানুভূতির উল্লেখ করেছেন। যেন তিনি বলেছেন : হে মানবজাতি! তোমাদের কষ্ট ও বিপদ, তোমাদের পাপাচার এবং যুদ্ধ ও জিহাদের কারণে

৯. আল্-কুরআনম, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯।

১০. আল্-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১৬।

তোমাদের দু:খ-কষ্ট রাসূলুল্লাহ্‌র অন্তরকে ব্যথিত করে এবং তোমাদের উপকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি সর্বদা উদ্বিগ্ন।

বস্তুত: মানব জাতির প্রতি এ কল্যাণ কামনাই তাঁকে তোমাদের মধ্যে সত্য প্রচারের এবং তোমাদের সত্য পথে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর যারা তাঁর আহ্বান ও উপদেশ গ্রহণ করে, তাদের সাথে তিনি স্নেহপূর্ণ আচরণ ও কোমল ব্যবহার করেন।

মোটকথা, এ আয়াতে এ সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকামী ছিলেন এবং বিশেষ করে মুমিন-মুসলমানদের প্রতি তিনি ছিলেন স্নেহশীল ও কোমল হৃদয়। এটি তাঁর বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে খোদায়ী সাক্ষ্য!

উল্লেখ্য যে, ইসলামের বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র মুখ থেকে মানুষকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, তার সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। একজন কর্মতৎপর নবী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র জীবন ও চরিত্র প্রকৃতপক্ষে আল্-কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর ওপর যখন যে বিধান নাযিল করা হয়েছে, তখনই তিনি তা নিজেই কার্যকরী করে দেখিয়েছেন।

যেমন– ঈমান, তাওহীদ, নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সাদকা, খয়রাত, জিহাদ, ত্যাগ, কুরবানী, হিন্মত, দৃঢ়তা, সবর, শোকর এবং এছাড়াও সৎ কাজ ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে যত কথা তিনি বলেছেন, সবকিছুতেই তিনি নিজের বাস্তব কর্মজীবন দিয়ে নমুনা পেশ করেছেন। যা কিছু আল-কুরআনে আছে, তার সবকিছুই তার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

স্মর্তব্য যে, একদা কিছু সাহাবী হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে হাজির হয়ে বলেন :

'হে উম্মুল মুমেনীন! আমাদের নিকট রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র স্বভাব ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন।' জবাবে তিনি বলেন : তোমরা কি কুরআন পড়োনি?

كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰه صلم اَلْقُرْاَنُ.

অর্থাৎ 'সমস্ত কুরআনই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র'। (আবু দাউদ বর্ণিত) এর মর্ম এই যে, আল-কুরআন হচ্ছে শব্দ ও

বাক্যের সমষ্টি, আর মুহম্মদ (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র তার ব্যাখ্যা।

উল্লেখ্য যে, কোন মানুষের চরিত্র, অভ্যাস ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে তার স্ত্রীর চাইতে অধিক আর কেউ জানতে পারে না। হযরত খাদীজা (রা.) কে বিয়ে করার পনের বছর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) নবুওতের দাবি করেন। একজনের পক্ষে অপরজনের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস প্রভৃতি জানার জন্য পনের বছরের সংসর্গ যথেষ্ট।

তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মুখ থেকে নবুওতের দাবি উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই হযরত খাদীজা (রা.) তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যান। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নবুওতের বিরাট দায়িত্বের চাপে ঘাবড়িয়ে উঠেন, তখন হযরত খাদীজা (রা.) তাকে প্রবোধ দান করে বলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছাড়বেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করেন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ-আদায় করেন, গরীবের সাহায্য করেন, মেহমানকে আপ্যায়িত করেন, হকের পক্ষ অবলম্বন করেন, আপনি বিপদে মানুষের সাহায্য করেন।"

(বুখারী শরীফ বর্ণিত, বস্তুত: এগুলি হচ্ছে তাঁর জীবনের বাস্তব তৎপরতার দৃষ্টান্ত। নবুওয়ত লাভের আগে ও তিনি এ সব কাজ সম্পাদন করতেন।)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) এর হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন তার সর্বাধিকপ্রিয়। তিনি দীর্ঘ নয় বছর তার সাহচর্যে থাকেন। তিনি এরূপ সাক্ষ্য দেন :

রাসুলুল্লাহ (সা.) কাউকে অভিশাপ দিতে, কাউকে নিন্দা করতে বা কারো সাথে কর্কশ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি খারাপ আচরণের বিপরীতে খারাপ ব্যবহার করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন। তিনি কখনো কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তিনি কখনো কোন চাকর-চাকরানী, পুরুষ অথবা নারী, এমনকি কোন পশুকেও কোনদিন আঘাত করেননি। তিনি কখনো কারো বৈধ আবেদন ও অনুরোধ অগ্রাহ্য করেননি।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর দিন-রাতের অবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) এর চাইতে অধিক কেউই ওয়াকেফহাল ছিলেন না। তিনি শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ

(সা.)-এর সাহাচর্যে ছিলেন।

তিনি বলেন : " রাসুলুল্লাহ (সা.) সদা প্রফুল্ল, কোমল স্বভাবের ও সদাচারী ছিলেন। তার প্রকৃতি ছিল করুণাসিক্ত। তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি কখনো কোন খারাপ কথা তার মুখ দিয়ে বের করতেন না। তিনি মানুষের কোন দোষ ও দুর্বলতা খুঁজে বেড়াতেন না। কারোর কোন অনুরোধ যদি তার পছন্দ না হতো, তবে তিনি চুপ থাকতেন। স্পষ্ট জবাব দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেন না। বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যবহারের দ্বারাই প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারতো। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি কারো আশা ভংগ করতে চাইতেন না, আশা-আকাংখা ছিনিয়ে নিয়ে কারো হৃদয়কে ভেংগে দিতেন না, বরং হৃদয়ের মলম লাগানই ছিল তার কাজ। কেননা, তিনি ছিলেন দয়ার্দ্র হৃদয় ও করুণাশীল।"

হযরত আলী (রা.) আরো বলেন : " রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন উদারচেতা, অত্যন্ত দানশীল, সত্যভাষী ও কোমল স্বভাবের অধিকারী। লোকেরা তার কাছে বসে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। যে ব্যক্তি প্রথমবার তাঁকে দেখতো সে ভীত হতো; কিন্তু এরপর যতই তার সাথে মেলামেশা করতো, ততই তাকে অধিক ভালবাসতে শুরু করতো।" (শামায়েলে তিরমিযী)

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পাঠ করে ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'গীবন' হুবহু এমতই ব্যক্ত করেছেন।

হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রথম স্বামীর পুত্র হযরত হিন্দ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা.) কোমল স্বভাবের ছিলেন, কঠোর ছিলেন না। তিনি কারো মনে দুঃখ দিতেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারে অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কারো মর্যাদা-হানিকর কোন কথা তিনি বলতেন না। যে ধরনের খাদ্য সামনে আসতো– তিনি তা আহার করতেন, তাকে খারাপ বলতেন না। নিজের ব্যক্তিগত কারণে তিনি কখনো কারো প্রতি রাগান্বিত হতেন না, কারো নিকট থেকে কোন বিনিময় বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং কারো মনে কষ্ট দিতেন না। কিন্তু যদি কেউ কোন সত্য কথার বিরোধিতা করতো, তাহলে সত্যের পক্ষালম্বনে তিনি রাগান্বিত হতেন এবং সে সত্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেন।" (শামায়েলে তিরমিযী বর্ণিত)

বস্তুত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের উজ্জ্বলতম দিক হচ্ছে এই যে, তিনি নবী হিসেবে নিজের অনুসারীদের যে সমস্ত উপদেশ দেন, সর্বপ্রথম তিনি নিজেই সেগুলি প্রতিপালন করেন।

যেমন, তিনি মানুষকে উপদেশ দিতেন সব সময় আল্লাহর স্মরণ বা জিকির করতে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষন করতে। এ উপদেশের যে প্রভাব সাহাবীদের জীবনে ফুটে উঠে, তা অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনে দিন-রাতের মধ্যে এমন সময় খুব কমই ছিল, যখন তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত থাকতো। ওঠাবসা, চলাফেরা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ইত্যাদি সর্বাবস্থায় ও সর্বসময় আল্লাহর নাম তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হতো। হাদীস গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশে তাঁর সেই পবিত্র বাণী ও দোয়াগুলো লেখা আছে। এগুলো বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার কণ্ঠে জারী থাকতো।

উল্লেখ্য যে, প্রায় দু'শো পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হেসনে হাসীন' গ্রন্থটি কেবল এসব বাণী ও দোয়ার সমষ্টি। এর প্রতিটি বাক্য ও ছত্র আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং খোদা-ভীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র কণ্ঠ সব সময় এ প্রশংসায় লিপ্ত থাকতো।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

অর্থ : "তারা দাঁড়িয়ে বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশের ওপর শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।"[১১]

এটিই ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের চিত্র। তাই হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা.) সব সময় আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকতেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি তার উম্মতদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার নিজের অবস্থা কি ছিল? ইসলামের বিধান অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আট ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।

---

১১. আল্-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯১।

যেমন– সূর্যোদয়ের পর ইশরাক, এরপর দিনের কিছু অংশ অতীত হলে চাশত, তারপর যথাক্রমে– যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা, অতঃপর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায তিনি নিয়মিত পড়তেন।

উল্লেখ্য যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পর তাহাজ্জুদের নামাজ সাধারণ মুসলমানদের জন্য মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) এ নামাজটিকে সারাজীবন প্রতি রাতে আদায় করতেন। আর তিনি প্রায় সারারাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পবিত্র পদদ্বয় ফুলে যেতো। এরূপ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন :

"ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তায়ালা যেন আপনার সব ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবুও আপনি এতো কষ্ট করেন কেন?" এর জবাবে তিনি বলতেন : হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহর শোকর-গুজার বান্দা হবো না?'

অর্থাৎ এ নামাজ আল্লাহর ভয়ে নয়, বরং খোদা প্রেম, রুকুতে তিনি বহুক্ষণ ঝুঁকে থাকতেন, এমন কি লোকেরা মনে করতো যে, তিনি সিজদা করতে ভুলে গেছেন।

স্মতর্ব্য যে, নবুওতের শুরু থেকে তিনি নামাজ পড়তেন, কাফিররা তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল; তবুও তিনি হারেম শরীফের ভিতর গিয়ে সবার সামনে প্রকাশ্যে নামাজ পড়তেন। এ অবস্থায় কাফিররা কয়েকবার তাঁর ওপর হামলা করে। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে বিরত হননি।

উল্লেখ্য যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে নামাজ পড়া ছিল সব চাইতে কঠিন কাজ। যুদ্ধের সময় যখন দু'দলের সেনারা যুদ্ধে লিপ্ত; তীর, তরবারি ও বর্শা মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করছে, এমন সময় নামাজের ওয়াক্ত হলে তিনি সাথে সাথে সাহাবাদের নামাজের জন্য কাতারবদ্ধ করতেন।

স্মরণীয় যে, বদরের যুদ্ধের দিন যখন সমস্ত মুসলিম বাহিনী কাফিরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়ে দোয়ায় রত ছিলেন।

সারা জীবনে তাঁর কোন নামাজ নির্ধারিত সময় থেকে বিচ্যুত হয়নি। আর দু'ওয়াক্ত ছাড়া তাঁর কোন ওয়াক্তের নামাজ কাযাও হয়নি। একবার খন্দক

যুদ্ধে কাফিরা আসরের নামাজ আদায়ের সুযোগ দেয়নি, আর একবার একটি যুদ্ধ সফরে সারারাত চলার পর ফজরের নামাজের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই পরে কাযা নামাজ আদায় করেন।

উল্লেখ্য যে, এর চাইতে ও কঠিন অবস্থা ছিল তাঁর মৃত্যুপীড়ার সময়। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কষ্টও হচ্ছিল অবর্ণনীয়। কিন্তু নামাজ, এমনকি জামায়াতের সাথে নামাজ পড়াও তিনি ত্যাগ করেননি। চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি সাহাবীদের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে যেতেন। ইন্তিকালের তিন দিন পূর্বে যখন তিনি উঠার চেষ্টা করেন, তখন হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়েন, এবং তিনবার এ অবস্থা হয়। এ সময় তিনি জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা পরিত্যাগ করেন।

ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় ফরজ বিধান হলো– রোযা। সমস্ত মুসলমানের উপর সারা বছরে মাত্র এক মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, রোজা ছাড়া তার একটি সপ্তাহ এবং একটি মাসও অতিবাহিত হতো না।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : ‘ রাসুলুল্লাহ (সা.) রোযা রাখা শুরু করতেন, তখন মনে হতো, হয়তো আর কোন দিন তিনি রোযা রাখা বাদ দেবেন না।’

উল্লেখ্য যে, তিনি সাহাবীদের নফল রোযা রাখতে নিষেধ করতেন, কিন্তু তার নিজের অবস্থা এই ছিল যে, কখনো কখনো দুই-তিন দিন যাবত কিছুই খেতেন না এবং এভাবে একদিক্রমে দুই-তিন দিন রোযা রাখতেন। এ সময় তিনি খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করতেন না।

সাহাবীগণ যদি এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করতে চাইতেন, তাহলে তিনি বলতেন : তোমাদের মধ্যে কে আমার ন্যায়? আবার রব তো আমাকে পানাহার করান। বছরের দুটি মাস– রমযান ও শাবান তার রোযার মধ্য দিয়ে কেটে যেতো। প্রত্যেক মাসেই তিনি কয়েকদিন রোযা রাখতেন। মহররমের দশ দিন শওয়াল মাসের ৬ দিন তিনি রোযার মধ্যেই অতিবাহিত করতেন। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি রোযা রাখতেন। এ হলো রোযার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাস্তব জীবনের চিত্র।

তিনি তার অনুসারীদের যাকাত ও সাদাকা প্রদানের হুকুমের দিয়েছেন। কিন্তু সর্বপ্রথম তিনি নিজে এ বিষয়ে আমল করে দেখিয়েছেন। এ সম্পর্কে হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাক্ষ্য আগে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করে দেন, গরীব ও বিপগ্রস্তদের সাহায্য করেন।"

স্মর্তব্য যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এ কথা বলেননি যে, তোমরা সব কিছু ত্যাগ করে আমার পেছনে এসে দাঁড়াও। তিনি ঘর-সংসার যথা-সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার হুকুমও দেননি। তিনি বলেন, যেমন আল্লাহর বাণী ও নির্দেশ :

أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم

অর্থাৎ "তোমাদের যে সম্পদ আমি দান করেছি, তার একটি অংশ গরীব-মিসকীনদের কল্যাণে ব্যয় করো।"[১২]

বস্তুত: এ ব্যাপারে তার নিজের রীতি এই ছিল যে, তার নিজের কাছে যা কিছু আসতো, তা সবই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়ে যেতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিজয় অভিযানের ফলে অর্থ-সম্পদের আমদানী কম ছিল না। কিন্তু সে সব ছিল অন্যের জন্য, তার নিজের জন্য কিছুই ছিল না। অভাব-অনটন ও অনাহার ছিল তার নিত্য-সাথী।

উল্লেখ্য যে, খায়বর বিজয়ের পর অর্থাৎ সপ্তম হিজরী থেকে তিনি নিয়মিতভাবে মহিয়সী ও পূতচরিত্রা স্ত্রীদের সারা বছরের খোরাক দিয়ে দিতেন। কিন্তু বছর শেষ হবার আগেই তাদের খাদ্য-শস্য ফুরিয়ে যেতো। কেননা, খাদ্য-শস্যের বিরাট অংশ অভাবীদের ঘরে চলে যেতো।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা.) সবার চাইতে অধিক দানশীল ছিলেন এবং সব চাইতে বেশী পরিমাণে দান করতেন তিনি রমযান মাসে। জীবনে কারো আবেদনের জবাবে তিনি 'না' বলেননি। তিনি কখনো একাকী কোন জিনিস খেতেন না। যত সামান্য পরিমাণ জিনিসই হোক না কেন, উপস্থিত সবাইকে তিনি তার সাথে শরীক করতেন। তিনি এভাবে নির্দেশ দেন যে, 'যে মুসলমান ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা যাবে, তার সংবাদ আমাকে জানাবে, আমি তার ঋণ শোধ করে দেব। আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত

১২. আল্-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৪।

সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হবে তার ওয়ারেসরা।

একবার জনৈক বেদুঈন এসে তাঁকে বলে : 'হে মুহাম্মদ! এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার পিতারও নয়। এগুলো আমার উটের পিঠে চাপিয়ে দাও।' তিনি জোয়ারও খেজুর দিয়ে তার উটের পিঠ বোঝাই করে দেন এবং এভাবে বলার জন্য মোটেই রাগান্বিত হননি। তিনি বলতেন :

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِىْ.

অর্থাৎ "আমি হচ্ছি বিতরণকারী ও খাজাঞ্চী এবং আসল দাতা হচ্ছেন– আল্লাহ তায়ালা।" (আল-হাদীস)

হযরত আবু যার (রা.) বলেন : এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হাঁটছিলাম। পথে তিনি বললেন : 'হে আবু যার! যদি ওহোদের এ পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় রূপান্তরিত করা হয়, তাহলে তিনরাত পর তা থেকে একটি দীনার ও আমার নিকট অবশিষ্ট থাকা আমি পসন্দ করবো না। তবে যদি কোন ঋণ থাকে, তাহলে তা শোধ করার জন্য হয়তো কিছু রাখতে পারি।"

বস্তুত: এসব কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোমুগ্ধকর বাণীই ছিল না, বরং এ ছিল তাঁর যথার্থ সংকল্পের প্রকাশ। আর তিনি এ সব কর্মে পরিণত করে দেখিয়েছেন।

যেমন– একবার বাহরাইন থেকে খেরাজ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আসে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন :

'এগুলো মসজিদের উঠানে ঢেলে দেয়া হোক! ফজরের নামাজের সময় যখন তিনি মসজিদে আসেন, তখন ধন-সম্পদের স্তূপের দিকে চোখ উঠিয়েও দেখলেন না। তিনি নামাজের পর সে স্তূপের কাছে বসে তার বিতরণ শুরু করেন। যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি তার কাপড় ঝেড়ে এমনভাবে উঠে পড়লেন, যেন এ গুলি ছিল ময়লা-আবর্জনা এবং তাঁর জামা-কাপড় এর দ্বারা নষ্ট হচ্ছিল।

উল্লেখ্য যে, একবার ফিদাক থেকে চারটি উট বোঝাই খাদ্যশস্য এলো। তার কিছু ঋণ ছিল। তিনি তা আদায় করলেন এবং কিছু বণ্টন করে দেন। এরপর তিনি বেলাল (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন। আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি? তিনি

বলেন : আর কোন প্রার্থী নেই, তাই কিছুটা রয়ে গেছে। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন :

'যতক্ষণ দুনিয়ার এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আমি ঘরে প্রবেশ করতে পারি না। এরপর তিনি রাতটি মসজিদে কাটিয়ে দেন। সকালে হযরত বেলাল (রা.) এসে বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন : অর্থাৎ যা কিছু অবশিষ্ট্য ছিল, তা সব বিতরণ করা হয়েছে।" এ কথা শুনে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করেন।

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন : একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) দুঃখিত ও বিষণ্ন মনে ঘরে ফিরে আসেন। আমি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন : 'উম্মে সালমা! গতকাল যে সাতটি দীনার এসেছিল, তা আজ সারা দিন গত হয়ে যাওয়ার পরও আমার বিছানার ওপর পড়ে আছে।'

বস্তুত: এ সবই ঘটনা তাঁর কর্মজীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোহদ বা অল্পে-তুষ্টির শিক্ষা দান করেছেন। আর এ ব্যাপারে তার নিজের কর্ম-পদ্ধতি এই ছিল যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ জিযিয়া, খেরাজ, উশর, যাকাত ও সাদাকা যখন মদীনায় আসছিল, তখন গোটা আরবের শাসনকর্তার ঘরে আগেরই মত অভাব ও অনাহারের ধারাই চলছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : " রাসুলুল্লাহ (সা.) এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু তিনি কখনো দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারেননি।" তিনি আরো বলেন : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তিকালের সময় তার ঘরে সেদিনের খাবার জন্য সামান্য জোয়ার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর কয়েক সের যবের বিনিময়ে এক ইহুদির নিকট তাঁর লৌহ বর্ম বন্ধক রাখা ছিল।'

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন : "আদম সন্তানের জন্য এ কয়েকটি বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুর অধিকার নেই, আর তা হলো : বসবাসের জন্য একটি কুঁড়ে ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা কাপড় এবং ক্ষুধা মিটাবার জন্য শুকনো রুটি ও পানি।" (তিরমিযী বর্ণিত)

উল্লেখ্য যে, এসব নিছক চিন্তাকর্ষক কথাই ছিল না, বরং এ ছিল রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন-যাত্রার বাস্তব চিত্র।

তাঁর বসবাসের জন্য ছিল মাত্র একটি কুঠরী। তার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতা ও উটের চুল দিয়ে ছাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন :

"রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় কখনো ভাঁজ করে রাখা হতো না। অর্থাৎ তিনি যে কাপড় পরতেন, তাছাড়া আর কোন অতিরিক্ত কাপড় তাঁর ছিল না, যা ভাঁজ করে রাখা যেতে পারে।"

একদা জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে বলে : 'আমি বড় ক্ষুধার্ত।' তিনি তাঁর বিবিদের কাছে বলে পাঠালেন কিছু খাবার থাকলে পাঠিয়ে দিতে। প্রত্যেক বিবির নিকট থেকে খবর এলো, 'ঘরে পানি ছাড়া আর কিছু নেই'।

হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, একদিন আমি দেখলাম যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে আছেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় এপাশ ওপাশ করছেন।

একবার সাহাবাগণ তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে অনাহারে থাকার অভিযোগ করলেন এবং পেটের কাপড় সরিয়ে দেখালেন যে, সেখানে একটি পাথর বাঁধা আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর পেটের কাপড় সরালেন, দেখা গেল সেখানে একটির পরিবর্তে দু'টি পাথর বাঁধা আছে। অর্থাৎ তিনি দু'দিন থেকে অনাহারে ছিলেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুধার কারণে তার গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যেতো।

একদিন অনাহারে থাকাবস্থায় রাসুলুল্লাহ ঘর থেকে বের হন এবং হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর ঘরে যান। তখন হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) বাগান থেকে খেজুর কেটে আনে এবং তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেন। খাবার সামনে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি রুটির ওপর সামান্য গোশত রেখে বলেন : এটি ফাতিমা (রা.) এর নিকট পাঠাও, কয়েক দিন থেকে তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি।

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)ও দৌহিত্র ইমাম হাসান ও হুসাইন (রা.) কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু গোটা আরবের শাসনকর্তা তাঁর এ ভালবাসাকে মূল্যবান পোশাক ও সোনা-রূপার অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রকাশ করেনি।

একবার তিনি হযরত আলী (রা.)-এর প্রদত্ত একটি সোনার হার হযরত ফাতিমার গলায় দেখে বলেন :

'হে ফাতিমা! তুমি কি লোকের মুখ থেকে এ কথা শুনতে চাও যে, মুহাম্মদের কন্যা তার গলায় আগুনের শিকল পরে আছে?' হযরত ফাতিমা (রা.) তখনই হার গলা থেকে খুলে নিয়ে বিক্রি করে দেন এবং তার মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে আযাদ করে দেন।

অনুরূপভাবে একবার হযরত আয়েশা (রা.) সোনার কাকন পরিধান করলে তিনি তা খুলে দেন এবং বলেন : 'এটি মুহাম্মদের স্ত্রীর জন্য উপযোগী নয়।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : 'একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন, মানুষের জন্য দুনিয়ার ঠিক ততটুকুই যথেষ্ট।

এসব তাঁর উক্তি এবং তাঁর কাজও ছিল এর সাথে পূর্ণ সংগতিশীল। একবার কতিপয় সাহাবী তার সাথে দেখা করতে এসে দেখেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে বিছানার গভীর দাগ পড়ে গেছে। তারা বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক তৈরী করে আনতে" চাই। তিনি জবাব দিলেন : "দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু, যতটুকু একজন অশ্বারোহী ব্যক্তির সম্পর্ক গাছের ছায়ার সাথে, যে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। তারপর আবার তার নিজের গন্তব্য স্থানের দিকে এগিয়ে চলে।"

উল্লেখ্য যে, নবম হিজরীতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ঘরে মোট আসবাব-পত্রের মধ্যে ছিল :

"তাঁর পরনের জন্য একটি তহবন্দ, একটি বিছানা ছাড়া খাট, খেজুর গাছের ছালে ভরা একটি বালিশ, ঘরের এক কোণে সামান্য পরিমাণ যব, একদিকে একটি পশুর চামড়া এবং খুঁটিতে ঝুলানো একটি পানির মশক।"

বস্তুত: কুরবানী বা ত্যাগ সম্পর্কে অনেককে বক্তৃতা দিতে শোনা যায়। কিন্তু তাদের কারো জীবনে এর বাস্তব চিত্র দেখা যায় না। এর চিত্র দেখা যায়– মদীনার অলিতে গলিতে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তার সাহাবীদেরকে ত্যাগের শিক্ষা

দেন এবং এই সাথে তাদের সামনে নিজের আদর্শ ও পেশ করেন।

যেমন– তিনি তাঁর আদরের মেয়ে ফাতিমা (রা.) কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতের তালুতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল এবং মশকে করে পানি আনতে আনতে বুকে নীল দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থান একদিন তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে একটি খাদিম দান করার জন্য আবেদন করলে, জবাবে তিনি বলেন : 'হে ফাতিমা! এখনো সুফ্ফার গরীবদের সুরাহা করতে পারলাম না। এমতাবস্থায় তোমার আবেদন কেমন করে পুরণ করতে পারি?'

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : 'হে ফাতিমা! বদরের এতিমরা তোমার পূর্বে আবেদন করেছে, তাদের কোন সুব্যবস্থা এখনো করতে পারিনি!

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গায়ে দেয়ার জন্য কোন চাদর ছিল না। জনৈক মহিলা সাহাবী একটি চাদর এনে তাকে দেন। তখন এক ব্যক্তি বলে : কী উত্তম চাদর! এ কথা শুনে তিনি চাদরটি দিয়ে দেন।

উল্লেখ্য যে, একদিন তিনি সুফ্ফার গরীবদের নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন : 'ঘরে যে খাদ্য আছে হাজির করো। তখন আটার ভূসির হালুয়া হাজির করা হলে, তা যথেষ্ট হলো না। তখন তিনি আরো কিছু খাবার চাইলেন। তখন তাদের সামনে খেজুরের তৈরী হারীরা (পানীয়) পেশ করা হয়। তারপর দুধের পেয়ালা মেহমানদের সামনে হাজির করা হয়, তা ছিল তার ঘরের সর্বশেষ সম্বল।

বস্তুত : এই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ত্যাগ ও কুরবানী, নিজের জীবনে তিনি এভাবেই তার বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন।

আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার চিত্র দেখতে হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্-কুরআনে আল্লাহর এরূপ নির্দেশ :

وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوْالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

অর্থ : "আর আপনি তেমনি ছবর ও দৃঢ়তা দেখান, যেমন ছবর ও দৃঢ়তা

দেখিয়েছেন মহাপরাক্রমশালী রাসূলগণ।"[১৩]

তিনি অবশ্যই ঠিক তেমনি ছবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি এমন একটি মূর্খ ও অশিক্ষিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। যারা তাদের বিশ্বাস আকীদার বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে পারতো না এবং এজন্য প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হতো। কিন্তু তিনি কখনো এসবের পরোয়া করেননি। তিনি হেরেম শরীফের মধ্যে গিয়ে তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করতেন এবং সেখানে সবার সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। হেরেম শরীফের উঠানে বসতো কুরাইশ নেতাদের মজলিশ।

এরপর আল-কুরআনের আল্লাহর এ নির্দেশ যখন নাযিল হয় :

فَاصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرْ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তা স্বরবে ঘোষণা করুন।'[১৪]

উল্লেখ্য যে, এ আয়াত নাযিল হবার পর তিনি সাফা পাহাড়ের উপর উঠে কুরাইশদের আহ্বান করেন এবং আল্লাহর এ বিধান শুনিয়ে দেন যে, তোমরা স্বীকার কর :

لاَاِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللهِ.

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।" তোমরা যদি একথা স্বীকার কর, মেনে নেও; তবে তোমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

তাঁর এ আহ্বান শুনে কুরাইশরা তার সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে। অত্যন্ত অমানুষিকভাবে তাঁকে পীড়া ও কষ্ট দেয়। হেরেম শরীফের মধ্যে তার পবিত্র দেহে নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করে। গলায় চাদর জড়িয়ে তাকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করে। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়। কিন্তু এতদাসত্ত্বেও আল্লাহর পথ থেকে তিনি এক চুল ও বিচ্যুত হননি। চাচা আবু তালিব যখন তার সমর্থন উঠিয়ে নেবার ইংগিত দেয়, তখন তিনি তাকে বলেন :

---

১৩. আল-কুরআন;

১৪. আল-কুরআন;

"চাচা জান, যদি কুরাইশরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না।" অবশেষে তাঁকে তাঁর সাথী-সংগী ও পরিবার-পরিজনসহ শি'আবে আবু তালিবে বা আবু তালিবের গিরি সংকটে প্রায় তিন বছর কয়েদ করে রাখা হয়। তাঁর ও তাঁর খান্দানকে সামাজিক বয়কট করা হয়। তাদের নিকট খাদ্য-শস্য সরবরাহ বন্ধ করা হয়। শিশুরা মায়ের স্তনের দুধ না পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতো এবং যুবকরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতো। অবশেষে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এসব কিছুই সংঘটিত হয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সবর ও দৃঢ়তাহারা হননি।

উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় তিনি ও তার সাথী আবু বকর সিদ্দীক (রা.) 'সূর' নামক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। কাফিরা তার পশ্চাদানুসরণ করে গূহার মুখে পৌঁছে যায়। সাথী আবু বকর (রা.) শংকিত হন। তিনি বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো মাত্র দু'জন।' কিন্তু বিশাল ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ একটি আওয়াজ শ্রুত হলো : "হে আবু বকর! আমরা দু'জন নই, তিন জন। যেমন আল্লাহর বাণী :

لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللهَ مَعَنَا.

"অর্থ : ভীত হবেন না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[১৫]

স্মর্তব্য যে, এ হিজরাতের পথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রেফতার করার জন্য 'সুরাকা ইবন জাসাম' তার ঘোড়ার পিঠে চড়ে, বর্শা হাতে নিয়ে তার নিকট ছুটে আসে।

তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) আমরা তো গ্রেফতার হয়ে গেছি।"

কিন্তু রাসূলে খোদা (সা.) তখনো কুরআন পাঠ করছিলেন এবং তাঁর অন্তর গভীর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। সুরাকার ঘোড়ার পা বালুর মধ্যে ধ্বসে যায়; পরে, সে ইসলাম কবুল করে।

উল্লেখ্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদী, মুনাফিক ও কুরাইশ হামলাকারীদের ভয় সৃষ্টি হয়। সাহাবীগণ রাত-

১৫. আল-কুরআন;

দিন সব সময় তাঁর আবাসস্থল পাহারা দিতেন। এ সময় আল-কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয় :

وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ "আর আল্লাহ আপনাকে লোকদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।"[১৬]

এ সময় তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন : 'তোমরা চলে যাও, আমাকে আমার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমার রব নিজেই আমার রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।'

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) নজদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম করছিলেন। আর সাহাবীগণ এদিক-সেদিক অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন খোলা তরবারি নিয়ে সেখানে হয়ে হাজির হয়ে বলে :

'হে মুহাম্মদ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন : 'আল্লাহ।' এ শক্তিপূর্ণ জবাবে শত্রু ভীত হলো এবং তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। রাসুলুল্লাহ (সা.) সে তরবারি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এবার আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?' সে ব্যক্তি প্রাণ ভিক্ষা চায় এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।'

বদর প্রান্তরে যুদ্ধ চলছে। প্রায় তিনশো নিরস্ত্র মুসলমান এক হাজার লৌহবর্ম পরিহিত সশস্ত্র কুরাইশ সেনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু ঐ তিনশো সিপাহীর সিপাপহসালার মুহাম্মদ (সা.) কোথায়? তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক স্থানে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দেয়ার মশগুল। কখনো সিজদা করছেন, আবার কখনো আকাশের দিকে হাত তুলে বলছেন : 'হে আমার রব! যদি আজ এ ছোট্ট দলটি ধরাপৃষ্ট থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে এ দুনিয়ায় তোমার ইবাদতকারীর আর কোন নাম-নিশানা থাকবে না।'

আল্লাহ তায়ালা তার হাবিব মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকুতি শোনেন এবং গায়েবী মদদ দিয়ে মুসলমানদের বিজয় দান করেন। আবু জেহেলসহ ৭০ জন কাফির নেতা এ যুদ্ধে মারা যায়।

---

১৬. আল-কুরআন;

উল্লেখ্য যে, ওহোদ-যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম সেনারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে আসে, তখন খোদার সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থাশীলও পরিপূর্ণ নির্ভরশীল রাসূল মুহাম্মদ (সা.) স্বস্থানে অটল ও অবিচল থাকেন। এ সময় শত্রুরা তার উপর তীর, তরবারী ও বর্শার দ্বারা হামলা করছিল। লৌহ শিরস্ত্রানের কড়া তার মস্তকে বিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল, মুখমন্ডল আঘাতের পর আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিল। কিন্তু তখনো তিনি ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দেন, এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখেন, নির্ভর করেন। কেননা, আল্লাহ্‌র কুদরত, শক্তি ও হেফাজতের ওপর তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

হোনায়েনের যুদ্ধের ময়দানে যখন দশ হাজার তীর বারিধারার মত বর্ষিত হচ্ছিল, তখন কিছু সময়ের জন্য মুসলিম বাহিনী পশ্চাদাপসরণ করে। কিন্ত এ যুদ্ধের সিপাহসালার মুহাম্মদ (সা.) আপন স্থানে অবিচল থাকেন। এ সময় তার মুখ থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল :

اَنَا النَّبِىُّ لاَكَذِبْ _ اَ نَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

অর্থাৎ "আমি মিথ্যা নবী নই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের প্রপুত্র।" তিনি তার সওয়ারী থেকে নীচে নেমে এসে বলেন : 'আমি আল্লাহর বান্দা ও পয়গম্বর। এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন। ফলে, আল্লাহ তাঁর হাবীবকে বিজয় দান করেন।

বস্তুত এ সবই ছিল তার কর্মজীবনের বাস্তব নজীর। আপনারা শত্রুকে ভালবাসার কথা শুনেছেন। কিন্তু এর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেননি। তা পাওয়া যাবে মদীনার রাসূলের মাঝে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করেন, তখন মক্কার কুরাইশ নেতারা ঘোষণা দেয় যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের মাথা কেটে নিয়ে আসবে, তাকে একশোটি উট পুরস্কার দেয়া হবে।

এ পুরস্কারের লোভে সুরাকা ইবন জাসাম তাঁর পেছনে ঘোড়া ছুটালেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন। সাথী হযরত আবু বকর (রা.) শংকিত হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করলে তিনবার তার ঘোড়ার বা বালুর মধ্যে বসে যায়। তখন সুরাকা তীর ও পাঞ্জা বের করে তার ভাগ্যলিপি গণনা

করলে, প্রতিবার জবাব আসে : মুহাম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করো না। এতে সে ভীত হয়ে পড়ে এবং ফিরে যাবার সংকল্প করে।

এ সময় সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে তার প্রাণ রক্ষার আবেদন জানিয়ে বলে : যখন আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে কুরাইশদের উপর বিজয় দান করবেন, তখন অনুগ্রহ করে আমার প্রাণরক্ষা করবেন। তিনি এ সম্পর্কে একটি ওয়াদাপত্র লিখিয়ে তার হাতে সোপর্দ করেন। মক্কা বিজয়ের পর সে ইসলাম কবুল করে। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে সেদিনের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি।

আবু সুফিয়ান কে? যে বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধী সেনাদলের সর্দার ছিল। যে ব্যক্তি ছিল হাজার হাজার মুসলমানের জীবননাশের কারণ এবং যে নিজেও কয়েকবার রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল।

কিন্তু বিজয়ের পূর্বে, যখন হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সামনে হাজির হন, তখন যদি ও তার প্রতিটি অপরাধ তার জন্য মৃত্যুদন্ডের দাবি করছিল; তবুও করুণার মূর্তপ্রতীক, রাহমাতুল্লিল আলামীন, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানকে বলেন : 'ভয়ের কোন কারণ নেই; মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক উর্ধ্বে।

উল্লেখ্য যে, তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.) কেবল তাকে ক্ষমাই করলেন না, বরং এও বললেন :

مَنْ دَخَلَ دارَ اَبِىْ سُفْيَانَ كَانَ اَمِنًا.

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে ও নিরাপত্তা লাভ করবে।" (আল-হাদীস)

এবার হিন্দার দিকে লক্ষ্য করুন। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। ইসলাম গ্রহণের আগে সে ওহোদের যুদ্ধে তার বান্ধবীদের সংগে নিয়ে যায়। যারা রনোন্মাদণা সৃষ্টিকারী গান গেয়ে গেয়ে কুরাইশ সেনাদের মনোবল বৃদ্ধি করছিল। এ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন। হিন্দা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা ও ইসলামের বীরযোদ্ধা হযরত হামযা

(রা.)-এর লাশের সাথে চরম বেয়াদবী করেছিল। সে তাঁর বুক চিরে ফেলেছিল, তার নাক-কান কেটে হার বানিয়েছিল এবং সে তার কলিজা দাঁত দিয়ে চিবিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্থির হয়ে পড়েন।

মক্কা বিজয়ের দিন সে-ও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে হাজির হলে তিনি বলেন : 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও।"

এ সার্বজনীন ক্ষমার অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে চিৎকার করে বলে উঠলো " 'হে মুহাম্মদ! আজকের আগে আমার নিকট তোমার খিমার চাইতে অন্য কারো খিমা অধিক ঘৃণ্য ছিল না। কিন্তু আজ থেকে তোমার খিমার চাইতে আর কারোর খিমা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় নয়।"

হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারীর নাম ছিল 'ওয়াহ্শী'। তায়েফ বিজয়ের পর সে অন্যত্র পলায়ন করে। এপর সে স্থানটি ও মুসলমানদের দ্বারা বিজীত হলে, সে অন্য কোথাও আশ্রয় পেলো না। লোকেরা তাকে বললো :

'হে ওয়াহ্শী! তুমি এখনো মুহাম্মদকে চিনতে পারোনি। একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) এর আশ্রয় ছাড়া তোমার জন্য আর কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থল নেই।

একথা শুনে সে আশ্বস্থ হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হাজির হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিলেন। প্রিয় চাচার শাহাদতের দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। হত্যাকারী সামনে হাজির, কিন্তু তিনি শুধু এতটুকু বললেন :

'হে ওয়াহ্শী। তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমাকে দেখলে আমার শহীদ চাচার স্মৃতি ভেসে ওঠে।'

উল্লেখ্য যে, ইসলাম, মুসলমান ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সব চাইতে বড় শত্রু এবং তাঁকে অধিক কষ্টদানকারী ব্যক্তি হচ্ছেন আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন, তখন সে তার নিজের ও খান্দানের সকল অপরাধের কথা স্মরণ করে ইয়ামনে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঠিকভাবে চিনতে পারেন। তিনি নিজে ইয়ামনে গিয়ে ইকরামাকে অভয় দান

করেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় আসেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তার আগমনের খবর শোনেন, তখন তিনি তাকে এত দ্রুত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উঠে দাঁড়ান যে, তার পবিত্র দেহের চাদর পড়ে যায়। তিনি আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠেন :

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ.

অর্থাৎ "হে হিজরতকারী সওয়ার! তোমার আগমন মুবারক হোক।' (আল-হাদীস)

চিন্তা করুন, কাকে এ মুবারকবাদ দান করা হচ্ছে। যার পিতা তাকে মক্কায় সব চাইতে বেশী কষ্ট দিয়েছিল, তাঁর শরীরে ময়লা নিক্ষেপ করেছিল, নামাজের অবস্থার তাঁর উপর হামলা করতে চেয়েছিল। তাঁর গলায় চাদর বেঁধে তাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। 'দারুন্নদওয়ায় তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল, বদরের যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং সব রকমের সন্ধি ও চুক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছিল, আজ তার দৈহিক স্মৃতি– পুত্রের আগমনে এ আনন্দ ও মুবারকবাদ!

জনৈক ইহুদী মহিলা কর্তৃক খাদ্যে বিষ প্রয়োগ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খয়বরে যান। এটি ছিল ইহুদী শক্তির প্রধান কেন্দ্রস্থল। যুদ্ধ হলো এবং তিনি শহর জয় করলেন।

এসময় জনৈক ইহুদী মহিলা দাওয়াত করে এবং তিনি সে দাওয়াত কবুল করেন। ইহুদী মহিলা খাওয়ার জন্য যে গোশত পেশ করে, তাতে বিষ মেশানো ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) গোশতের টুকরা মুখে দিয়েই বুঝতে পারেন যে, তাতে বিষ মেশানো আছে। ইহুদী মহিলাকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে অপরাধের কথা স্বীকার করে। কিন্তু রাহমাতুলিল আলামীনের তরফ থেকে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ এ বিষের প্রভাব তিনি সারা জীবন অনুভব করেন।

এবার তায়েফের কথা শুনুন। যে তায়েফ মক্কী জীবনের কঠিন-নির্যাতনকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে আশ্রয় দেয়নি। এমন কি তাঁর কথাও শুনতে চায়নি। যেখানকার সর্দার আবদ-ইয়ালীলের খান্দান তাঁকে বিদ্রুপ করেছিল। তারা বখাটে ছেলেদের রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি বিদ্রুপ করার জন্য লেলিয়ে

দিয়েছিল। শহরের গুন্ডাদল তার উপর হামলা করেছিল। তারা নির্মমভাবে তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করে; ফলে তার পদ-যুগল আহত হয় এবং তার জুতা রক্তে ভরে যায়।

সেদিন তার এত কষ্ট হয়েছিল যে, নয় বছর পর একদিন হযরত আয়েশা (রা.) যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন : "ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার জানতে ইচ্ছা হয় আপনার জীবনের সব চাইতে কঠিন ও কষ্টকর দিন কোনটি ছিল? জবাবে তিনি তায়েফে এই দিনের কথা উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য যে, ৮ম হিজরীতে মুসলিম বাহিনী তায়েফ অবরোধ করে। অবরোধ বেশ কিছু দিন স্থায়ী হয়, দূর্গ বিজিত হলো না। অনেক মুসলিম মুজাহিদ শহীদ হয়। এ অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) অবরোধ উঠিয়ে ফিরে আসার সংকল্প করেন। উৎসাহী মুসলমানরা এতে রাজি হচ্ছিল না, তারা তার কাছে তায়েফের জন্য বদ-দোয়া করার আবেদন জানায়। তিনি আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললেন : "হে আমার রব! আপনি তায়েফকে হিদায়েত দান করুন এবং তাকে ইসলামের নিকট নত করে দিন।"

লক্ষ্য করার বিষয়, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন শহরের জন্য দোয়া করছেন, যে শহরের লোকেরা তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করেছিল, তাকে আহত করেছিল এবং তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিল।

যে আবদে ইয়ালীলের খান্দান তায়েফে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওপর এসব জুলুম করেছিল, তাঁর পুত্র যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় আসে, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের পবিত্র মসজিদে তাদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি প্রত্যেক দিন এশার নামাজের পর তাদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। এরা হচ্ছে তারা, যারা প্রস্তরাঘাতে তাকে আহত করেছিল, তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছিল। এ হচ্ছে নিজের শত্রুকে ক্ষমা করা ও ভালবাসার জ্বলন্ত নজীর!

মক্কা বিজয়ের দিন সেখানকার অবস্থা ও দৃশ্য এরূপ ছিল : যে হেরেম শরীফের বারান্দায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়া হয়েছিল, সেখানে তাঁর ওপর নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে বসে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেখানে পরাজিত কুরাইশ নেতারা

দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠে থেকে মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমন ব্যক্তিও ছিল, যে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো; সেও ছিল, যে তাঁর নিন্দাবাদ করতো, সেও ছিল, যে তাঁকে গালি দিত; সেও ছিল যে তাঁর ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতো, সেও ছিল, যে তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছাতো; সেও ছিল, যে তাঁর ওপর তরবারি উঠিয়েছিল; সেও ছিল, যে তাঁর আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল এবং তাদের হৃদপিন্ড ও নাড়ি-ভূড়ি কেটে টুকরো টুকরো করেছিল। সেও ছিল যে দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদের কষ্ট দিতো, তাদের বুকের উপর নিজেদের অত্যাচারের অগ্নি-মোহর লাগিয়ে দিতো, তাদেরকে আগুনের মত জ্বলন্ত বালুর ওপর শুয়াতো, জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তাদের অংগে দাগ দিত এবং বর্শাঘাতে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতো।

এসব অপরাধীর দল সেদিন পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং তার পেছনে ছিল দশ হাজার রক্ত-পিপাসু তরবারী, যারা শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি ইংগিতের অপেক্ষায় ছিল।

এ সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ খুলেন এবং জিজ্ঞেস করেন : "হে কুরাইশগণ! বলো, আজ তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত?'

তারা বললো : "তুমি আমাদের শরীফ ভাই ও শরীফ ভাতিজা, আমরা তোমার থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশ্যা করি।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন : আজ আমি তোমাদেরকে তাই বলছি, যা হযরত ইউসুফ (আ.) তার জালিম ভাইদের বলেছিলেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

"অর্থাৎ আজকের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।"[১৭]

اِذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

অর্থাৎ "যাও, তোমরা মুক্ত।" এ হচ্ছে শত্রুদের ভালবাসা ও মাফ করার

১৭. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯২।

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ হচ্ছে নবী করীম রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও বাস্তব শিক্ষা। আর তা কেবল মুখরোচক বক্তৃতা ও সুমিষ্ট ভাষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সত্যিকার ঘটনা ও কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মগুলি তাদের পয়গম্বর ও ধর্ম প্রবর্তকগণের সুমিষ্ট বাণীসমূহের দিকে দুনিয়াকে আহ্বান করে বার বার সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে। কেননা, এসব ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু নেই।

অন্যদিকে ইসলাম তার রাসূলের কেবল কথা নয়, বরং কাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়। মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِىْ.

অর্থাৎ "আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত। এ ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু দুটি এখনো কায়েম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। (আল-হাদীস)

এজন্যই ইসলাম আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সাথে তার রাসূলের অনুসরণের দাওয়াত দেয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন অনুসরণযোগ্য এক সুমহান আদর্শ।"[১৮]

উল্লেখ্য যে, ইসলাম তার রাসূলকে আল্লাহর কিতাবের বাস্তব চিত্র ও আদর্শ হিসাবে পেশ করে। সমগ্র দুনিয়ায় একমাত্র ইসলামের পয়গম্বরই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি নিজের শিক্ষা ও নীতির সাথে সাথে নিজের কর্ম এবং দৃষ্টান্তও পেশ করেন। যেমন– যে নামাজের পদ্ধতি জানে না, তাকে বলে :

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْ نِىْ اُصَلِّىْ

অর্থাৎ "তোমরা সেভাবে নামাজ পড়ো, যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখ।" (আল-হাদীস) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনের শেষ হজ্জের দিকে

১৮. আল্-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ২১।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নবুয়ত-প্রদীপের চতুর্দিকে সোয়া লক্ষ পতঙ্গের ভীড় জমে উঠেছে। আর মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ পয়গাম শুনানো হচ্ছে :

আরবের বাতিল রসম-রেওয়াজ এবং বংশ-পরম্পরায় যুদ্ধের সিলসিলা আজ ভেঙে দেয়া হচ্ছে। এ বক্তব্যের সাথে সাথে তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নযীরও বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন :

"আজ থেকে সমস্ত প্রতিশোধের রক্ত বাতিল করা হলো। অর্থাৎ তোমরা সবাই পরস্পরের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর আমি সর্বাগ্রে আমার নিজের খান্দানের রক্ত– আমার ভাতিজা 'রাবীয়া ইবনে হারিসের' রক্তের বিনিময় মাফ করে দিলাম।"

তিনি আরো বলেন, "জাহিলী যুগের সকল প্রকার সুদের লেনদেন ও কারবার আজ থেকে বাতিল করা হচ্ছে। আর আমি সর্বপ্রথম আমার চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদের কারবার ভেঙে দিচ্ছি।"

জান ও মালের পর তৃতীয় মূল্যবান বস্তু হচ্ছে– ইজ্জত আবরু। মানুষের ইজ্জত-আবরুর সাথে যে সব ভ্রান্ত ও সংস্কারযোগ্য রসম-রেওয়াজের সম্পর্ক, সে গুলিকে সর্বপ্রথম কার্যত: বিলুপ্ত করার হিম্মত যেন বাহ্যত: নিজের অমর্যাদাও বে-আবরুর নামান্তর প্রতীয়মান হয়।

তাই দুনিয়ার বড় বড় সংস্কারকও দেশের কোন রসম-রেওয়াজের কার্যত: সংশোধনের সাহস খুব কমই করে থাকেন। মুহাম্মদন (সা.) মানুষকে সাম্যের শিক্ষা দান করেছেন।

বস্তুত: আরবে গোলামদেরকে সব চাইতে হীন মনে করা হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক সম-অধিকারের শ্রেষ্ঠত্বর আদর্শ পেশ করেন। তিনি একজন গোলামকে নিজের পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। আরবে গোত্রগত মর্যাদার তারতম্য এত প্রবল ছিল যে, যুদ্ধের সময় কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের লোক নিম্ন মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের লোকের বিরুদ্ধে তরবারী উঠানো অসম্মানজনক মনে করতো। কেননা, তারা মনে করতো যে, ছোট লোকদের রক্ত তাদের তরবারিকে নাপাক করে দেবে। কিন্তু যখন রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ ঘোষণা করলেন :

"হে লোকেরা! সাদার-কালোর ওপর এবং অনাবর ব্যক্তির-আরবীদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বেশী ভয় করে।"

উল্লেখ্য যে, তাঁর এ শিক্ষা উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত, ছোট-বড় এবং গোলাম ও মনিবের মধ্যকার পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে সবাইকে এক কাঁতারে দাঁড় করায়। কিন্তু এ জন্য বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। আর এ দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই পেশ করেন।

আর তা হলো : কুরাইশের শরীফ খান্দানের অন্তর্গত তাঁর নিজের ফুফাতো বোন 'যয়নবকে' নিজের আযাদকৃত গোলাম 'যায়েদের' সাথে বিয়ে দেন। পোষ্য-পুত্রকে গর্ভজাত সন্তান-মনে করার কুসংস্কার-নীতি যখন ইসলাম উঠিয়ে দিল, তখনই 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদকে' – 'যায়েদ ইবনে হারেসা' বলা হলো।

পোষ্য-পুত্র যে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাকে বিয়ে আরবে অবৈধ ছিল। কিন্তু এটি যেহেতু নিছক মৌখিক আত্মীয়তা ছিল। আসলে পরস্পরের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না এবং এ প্রথমটির কারণে আরবদের মাঝে নানাবিধ খান্দানী হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রটির স্থাপিত হয়েছিল, তাই এ প্রথা উঠিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এ নিয়ম ভংগ করে কার্যকরী দৃষ্টান্ত পেশ করার বিষয়টি মানুষের সব চাইতে প্রিয় বস্তু আবরুর সাথে সম্পর্কিত ছিল। কাজেই এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর রাসুলুল্লাহ (সা.) এগিয়ে এসে নিজেই এর দৃষ্টান্ত পেশ করেন।

যায়েদ ইবনে হারিসা যখন নিজের স্ত্রী যয়নবকে বনিবনা না হওয়াতে তালাক দেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁকে বিবাহ করেন। আর তখন থেকেই আরবের এ অবাঞ্ছিত প্রথাটি নির্মূল হয়ে যায় ও পোষ্যপুত্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত প্রথা থেকে দেশ নাজাত লাভ করে।

স্মর্তব্য যে, আদম (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত এবং সিরিয়া থেকে শুরু করে পাক-ভারত বাংলাদেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংস্কারধর্মী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও এমন কার্যকরী হিদায়েত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তব কর্মজীবনের দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের বর্ণনামতে যীশুকে যখন শুলির উপর চড়ানো হচ্ছিল, তখন তিনি অস্থিরভাবে বলছিলেন :

ايلى ايلى لما سبقتنى.

অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে?

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল :

اللَّهُمَّ الرَّفِيْقُ الاَ عْلٰى.

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ! হে আমার পরম সর্বোত্তম সাথী!" (আল-হাদীস)

এ দুটি কথার মধ্যে নিশ্চিতভাবে ভালবাসার স্বাদ, প্রেমের নিদর্শন ও খোদানির্ভর প্রশান্তির গভীরতার লক্ষ্য করা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির মধ্যে।

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলয়হে ওয়া 'আলা সায়েরিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন!"